নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার

(তৃতীয় খণ্ড)

সিরাজদ্দৌলা

(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য্য

B
891.44209
Bh 528Gn
v.3 c.2

জিজ্ঞাসা
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা

নাট্যসাহিত্যের আলোচনা
ও
নাটকবিচার

(তৃতীয় খণ্ড)

সিরাজদ্দৌলা

(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য্য
বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

—পরিবেশক—
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা

প্রকাশক
লেখাপড়া
৫১, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা

B 891.44209
Bh 5286 n V.3. c2

19680

মূল্য : এক টাকা চারি আনা

মুদ্রাকর
উদয়ন প্রেস
৬নং, কলেজ রো
কলিকাতা

সিরাজদ্দৌলা

সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ভারতবর্ষ শুধু একটি দেশ নহে—একটি মহাদেশ, ভারতবর্ষ 'মহামানবের সাগরতীর,' এই সকল উক্তি লইয়া আমরা গর্ব ও আক্ষেপ দুইই করিতে পারি; বরং গর্ব অপেক্ষা আক্ষেপ করিবার ইচ্ছাই বেশী জাগে। মহাদেশত্ব ভারতবর্ষের অন্যতম গৌরব বটে কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে উহাই ভারতের বড় দুর্বলতা—জাতীয়তা-উন্মেষের প্রবল অন্তরায়। 'নানা জাতি নানা ভাষা নানা পরিধান' এইটুকু যত সত্য, 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্'—তত বাস্তব সত্য নহে। দ্রাবিড় চীন শক-হুন দলের কথা যাহাই হউক, পাঠান মোগল ভারতের দেহে তেমন বেমালুম ভাবে লীন হইতে পারে নাই এবং পারে নাই বলিয়াই ভারতে হিন্দু-মুসলমান জাতির দ্বন্দ্ব সন্তোষজনক মাত্রায় আজিও প্রশমিত হয় নাই—আজিও ভারতে হিন্দু-মুসলমান-সমবায়ে অখণ্ড একটি জাতি সম্পূর্ণ ভাবে গঠিত হইতে পারে নাই। এই জাতি-দ্বন্দ্বের দুর্যোগের সুযোগ লইয়াই 'সাত সমুদ্র তের নদীর পারে'র ইংরেজ বণিকরা একদিন ভারতের স্বাধীনতা হরণ করে—ফলে, ভারত ইংলণ্ডেশ্বরের একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ভারত 'মহামানবের সাগরতীর' হওয়ায় আর যাহাই বৃদ্ধি পাক ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সংহতি যে বৃদ্ধি পায় নাই এবং সেই সংহতির অভাবে ভারতবাসী বিদেশী শাসনে-শোষণে যে জর্জরিত হইয়াছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এই জাতীয়তা-বোধের অভাবের ছিদ্র পথেই বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। পলাশীপ্রান্তরে বাঙলার স্বাধীনতা বিক্রীত হইয়াছে।

সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম যুগ-সন্ধির ইতিহাস—ক্রান্তি—পর্বের ইতিহাস। আর্য্য-অনার্য্যের সংযোগকে প্রথম সন্ধি এবং মুসলমান অধিকারকে দ্বিতীয় সন্ধি বলিয়া গ্রহণ করিলে, বলা যাইতে পারে সিরাজদ্দৌলার

ইতিহাস তৃতীয় সন্ধির ইতিহাস—ইংরেজ-অধিকারের আরম্ভের ইতিহাস। যুগ-সন্ধির ইতিহাস বলিয়া সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসের বিশেষ একটি গুরুত্ব আছে। আরো একটি কারণে সিরাজের ইতিহাস খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই তাৎপর্য্য—নব জাতি-চেতনার তাৎপর্য্য।

'জাতি' শব্দটিকে ব্যাপক ও শিথিল অর্থে প্রয়োগ করিয়া • না যাইতে পারে—ভারত-ইতিহাসের আদিম (অন্ধকার) যুগ, আর্য্য-অনার্য্যের জাতিদ্বন্দ্বের বিক্ষোভের মধ্য দিয়া বহিয়া আসিয়াছে। আর্য্য জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে, বিজিত অনার্য্যকে আত্মসাৎ করিয়া—শূদ্র অথবা পঞ্চম বর্ণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দিয়া, আর্য্য সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হয় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় তথা ভারতবর্ষ স্বাধতঃ আর্য্য ভূমিতে পরিণত হয়। তারপর, ভারত-ভূমিতে, ইতিহাসের কারখানায় আর্য্য-অনার্য্যের সমবায়ে আর্য্য-সংস্কৃতি-সম্পন্ন একটি জাতি গঠনের কাজ অবিরাম চলিয়াছে। অবশ্য তাই বলিয়া সব অনার্য্য জাতিই আর্য্য হইয়াছে বা সব অনার্য্য জাতিই (নৃ-গোষ্ঠীর হিসাবে) শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা নহে। দ্রাবিড় জাতির প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই যে শূদ্র হয় নাই বা পঞ্চম বর্ণ বলিয়া চিহ্নিত হয় নাই, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস তাহার বড় প্রমাণ। যাহা হউক, বৈদিক-যুগ হইতেই ভারতবর্ষীয় সমাজ যেমন **শ্রেণী-ভেদযুক্ত**, তেমনি **বর্ণ-ভেদযুক্ত** অর্থাৎ ভারত-বর্ষীয় সমাজে (ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই) একদিকে চলিয়াছে শ্রেণীদ্বন্দ্ব অন্য দিকে চলিয়াছে—জাতিদ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে—নানা গোষ্ঠীকে নিজ সমাজদেহে আত্মসাৎ করিতে করিতে আর্য্য-সমাজ রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া, অগ্রসর হইয়াছে—দ্রাবিড় চীন শক-হুন প্রভৃতি আগন্তুক নৃ-গোষ্ঠীরা আর্য্য-সংস্কারে-সংস্কৃত হইয়া বৃহত্তর আর্য্য-সমাজ (হিন্দু জাতি) সৃষ্টি করিয়াছে। আর্য্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন এই বৃহত্তর আর্য্য-সমাজ'ই ভারতীয় ইতিহাসে সংক্ষেপে 'হিন্দুসমাজ' বা হিন্দু জাতি নামে পরিচিত। 'হিন্দু' বলিতে এক নৃ-গোষ্ঠী এক ভাষা-ভাষী এবং সমান লোকাচার-সম্পন্ন কোন জাতি বুঝায় না। অর্থাৎ 'হিন্দু' এই

অর্থে জাতি নহে যে সমগ্র ভারতের হিন্দু এক ভাষায় কথা বলে, একরূপ খোরাক খায়, একরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে এবং এক রাজার বা শাসন-ব্যবস্থার অধীন। হিন্দু—সংস্কৃতি-ভিত্তিক জাতি। সংস্কৃতিগত স্বকীয়তায় হিন্দু অন্য সংস্কৃতি-গোষ্ঠী হইতে পৃথক—এই অর্থে 'হিন্দু' পৃথক জাতি বলিয়া পরিচিত এবং এবং এই হিন্দু জাতির ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাসে "হিন্দু-যুগ" নামে চিহ্নিত। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান-শাসনাধিকারের আরম্ভ সীমা পর্যন্ত (২০০০ খ্রীঃপূঃ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত) এই হিন্দু-যুগের অভিব্যাপ্তি।

এই যুগের পরে, ভারতবর্ষের ইতিহাস নূতন এক প্রকার জাতি-দ্বন্দ্বের জটিল পর্যায়ে প্রবেশ করে। এই পর্যায়ের ইতিহাস 'মুসলমান-যুগ' নামে পরিচিত—মুসলমান ধর্মাবলম্বী তুর্কী-পাঠান-মোগল জাতির শাসনাধিকারের ইতিহাস। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই যুগের ব্যাপ্তি। পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজবাহিনীর হস্তে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ে—এই যুগ কার্যতঃ—পরিসমাপ্ত হয়। তালিকাকারে ইতিহাসটুকু সম্মুখে রাখা যাউক।

১। দাস বংশ—(১২০৬—১২৮৮) * ৬। তৈমুর বংশ (মোগল)
২। খিলজী বংশ—(১২৮৮—১৩২১) (ক) বাবর—(১৫২৬—১৫৩০)
৩। তুঘলক বংশ—(১৩২১—১৪১২) (খ) হুমায়ুন (১৫৩১—১৫৫০)
* [শেরশা (১৫৫৫—১৫৫৬)]
৪। সৈয়দ বংশ—(১৪১৪—১৪৪৪) (গ) আকবর—(১৫৫৬—১৬০৫)
৫। লোদী বংশ—(১৪৫০—১৫২৬) (ঘ) জাহাঙ্গীর—(১৬০৫—১৬২৭)
(ঙ) শাজাহান—(১৬২৭—১৬৫৮) (চ) ঔরংজীব—(১৬৫৮-১৭০৭)—*
(ছ) বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১২) (জ) জাহান্দর শাহ—(১৭১২-১৭১৩)
(ঝ) ফারুখশিয়র—(১৭১৩-১৭১৮) (ঞ) মহম্মদ শাহ—(১৭১৯-১৭৪৮)
(ট) আহ্‌মদ শাহ—(১৭৪৮-১৭৫৪)—*আলিবর্দী খাঁ—১৭৪১-১৭৫৬
(ঠ) দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-১৭৫৯)—* (পলাশী-যুদ্ধ (১৭৫৭)
(ড) দ্বিতীয় শাহ আলম—(১৭৫৯-১৮০৬)—

পলাশী-যুদ্ধের পরে

* [তৃতীয় পাণিপথ-যুদ্ধ ১৭৬১—মারাঠা-শক্তি পর্য্যুদস্ত ;
মোগল-শক্তিও বিলুপ্তপ্রায়]

* দেওয়ানী হস্তচ্যুত ১৭৬৫—* ফৌজদারী ও বিচার বিভাগ হস্তচ্যুত ১৭৯০

(চ) দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-১৮৩৭)

(ছ) বাহাদুর শা—(১৮৩৭-১৮৫৮) *[সিপাহী-বিদ্রোহ। ভারত ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যে পরিণত * কোম্পানীর রাজত্বের অবসান।]

মুসলমান শাসনের রাজনৈতিক তাৎপর্য্য

মুসলমান শাসকগণের এই তালিকাটি, মুসলমান-যুগের বাহিরের রূপটিকে রেখারূপে প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু মুসলমান-যুগের ভিতরের রূপটি—আসল তাৎপর্য্য রহিয়াছে আরো গভীরে—যেখানে আর্য্য-অনার্য্য সংস্কৃতির সহিত নূতন একটি সংস্কৃতির বুঝাপড়া চলিয়াছে—মুসলমান সংস্কৃতিসম্পন্ন বৈদেশিক জনগোষ্ঠী ভারতকে মাতৃভূমি হিসাবে গ্রহণ করিয়া ভারতের স্বার্থের সহিত নিজেদের স্বার্থ মিলাইয়া দিয়াছে—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারত গঠিত হইতে চলিয়াছে। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে, হিন্দুর কাছে মুসলমান-শাসন ভিন্ন জাতির আধিপত্য বলিয়া মনে হইয়াছে এ কথা সত্য কিন্তু তেমনি সত্য এই কথাটুকুও যে মুসলমানীকরণের ফলে ভারতেরই জনসংখ্যার একাংশ মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় এবং মুসলমান বাদশাহরা ভারতকে বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করায়, শেষের দিকে মুসলমান শাসকেরও শাসনের বৈদেশিকতার মাত্রা অনেক পরিমাণেই হ্রাস পাইয়া যায়। মুসলমান সংস্কৃতি ভারতবর্ষে আগন্তুক, মুসলমান দেশের রাজা এবং হিন্দুভারতের রাষ্ট্রভাষা (?) সংস্কৃতের আসনে 'পারসী' ভাষা অধিষ্ঠিত হওয়ায়, ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত—তথা হিন্দু অভিমান ক্ষুব্ধ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে জাতি-দ্বন্দ্বের বিক্ষোভ সমাজ দেহে ব্যক্ত-অব্যক্তাকারে প্রবাহিত—এ সবই স্বীকার্য্য ; তেমনি ইহাও স্বীকার্য্য—রাষ্ট্র-ভাষা পারসী হইলেও, মুসলমান আমলে, প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র

করিয়া প্রদেশে প্রদেশে—সংকীর্ণ ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এক-জাতীয়তার অভিমান দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। যেমন ধরা যাক—বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের কথা। ধর্মীয় সংস্কারে পৃথক হইলেও বাংলাভাষা-ভাষী বলিয়া বাংলার অধিবাসী বলিয়া তাহারা 'বাঙালী' পরিচয়ে বিশেষিত হয়—মোটকথা ভাষা ও বাসভূমিকে কেন্দ্র করিয়া একটা ঐক্যের বৃত্ত রচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ—"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা"-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'পরাধীনতা'র যে লক্ষণ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেই লক্ষণটি প্রয়োগ করিয়া বলা যাইতে পারে—"যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনে আরূঢ় এবং অন্য দেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র"—এই সূত্রানুসারে মুসলমান শাসনাধীন ভারতকে পরতন্ত্র বা পরাধীন বলা যায় না। বঙ্কিমের প্রশ্নটি—"যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলণ্ডকে বা ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল তবে শাহজাঁহা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলিবর্দী-শাসিত বাংলাকে পরাধীন বলি কেন?—এখানে "বলা যায় না"—এই সিদ্ধান্তেরই রূপ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অর্থাৎ এই কথাই প্রচার করিতেছে যে মুসলমান-যুগটি এক হিসাবে বৈদেশিক শাসনের যুগ নহে। অবশ্য বঙ্কিমের দৃষ্টি—ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি—এবং সেই দৃষ্টি—যে দৃষ্টিতে—"ইহা নিশ্চিত যে ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র রাজ্য বটে।"—এই সত্য স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টির সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর দৃষ্টির ঐক্য থাকিবে সে আশা করা যায় না—মুসলমান-যুগের হিন্দুর দৃষ্টি ইংরেজ-যুগের হিন্দুর দৃষ্টির সহিত পুরো-পুরি মিলিয়া যাইবে এমন কথাও বলা যায় না। এইরূপ অবস্থায়, মুসলমান-যুগকে হিন্দুজাতির পরাধীনতার যুগ হিসাবে যেমন দেখা যাইতে পারে * তেমনি হিন্দু-মুসলমানের সমবায়ে বৃহত্তর ভারতীয় জাতি গঠনের প্রস্তুতি হিসাবেও দেখা যাইতে পারে, আবার হিন্দু ও মুসলমান জাতির দ্বন্দ্বের ইতিহাস রূপেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অবশ্য জাতি-দ্বন্দ্ব এত স্পষ্ট যে ঐটাই আগে চোখে পড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেই,—ঔরংজীবের হিন্দু-দ্বেষী শাসন-ব্যবস্থার ফলে,

ভারতবর্ষে জাতি-দ্বন্দ্বের রূপটি উৎকট আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি ধসিয়া পড়িতে থাকে। উত্তর ভারতে রাজপুত-জাতির আত্মরক্ষার চেষ্টায় বা প্রতিরোধে এবং দক্ষিণ ভারতে মারাঠা-জাতির অভ্যুদয়ে মোগল-আধিপত্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ঔরংজীবের মৃত্যুর পরে, সত্যই 'শকলুব্ধ গৃধ্রদের বীভৎস চীৎকারে 'মোগল-মহিমা রচিল শ্মশান শয্যা—মুষ্টিমেয় ভস্ম রেখাকারে হ'ল তার সীমা।' **মহম্মদ শাহের** রাজত্বকালে (১৭১৯-১৭৪৮) মোগল-সাম্রাজ্য, বাংলাকে বলে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়া তাহাই হয়—প্রধানমন্ত্রী **নিজাম উল্-মুল্ক** দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদৎ খাঁ এবং * বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকর্তা **আলিবর্দী খাঁ**ও কার্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। রোহিলা-নায়ক **আলিমহম্মদ খাঁ** রোহিলখণ্ডে রাজ্যস্থাপন করেন, গুজরাটে, মালবে, মারাঠা প্রভুত্ব স্থাপিত হয়,—পাঞ্জাবে **শিখগণ** প্রবল হইয়া উঠে। যেটুকু বাকী থাকে তাহার বেশ কিছু শেষ করে— * **নাদির শাহের** আক্রমণে (১৭৩৮-৩৯)— কাবুল ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাদশাহের হস্তচ্যুত হয়। আর অবশিষ্ট ক্রিয়া করে নাদির-সেনাপতি **আহ্‌মদ শাহ দুররাণীর (আবদালী)** উপর্যুপরি আক্রমণে—(১৭৪৮, ১৭৫০, ১৭৫২, * (১৭৫৬-৫৭), ১৭৫৯, ১৭৬১, ১৭৬২, ১৭৬৪, ১৭৬৬, ১৭৬৭,) মোগল মহিমার শ্মশান শয্যাই বটে। কেন্দ্রীয় শাসন বলিতে আর কিছুই থাকে না—বাদশাহী শাসন নামমাত্রে পর্যবসিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান সামন্তগণ যেন ভারতবর্ষকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইতে উদ্যত হন এবং একে অন্যকে গ্রাস করিয়া আপন অধিকার বৃদ্ধি করিতে মরিয়া হইয়া উঠেন। মারাঠারা **'হিন্দুপাতশাহী'**র স্বপ্ন দেখেন বটে কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে **তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে** (১৭৬১) সেই স্বপ্নের সমাধি ঘটে। এই বিশৃঙ্খলার মূলে দেখা যায় একদিকে আছে জাতি-দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে আছে—সামন্ত-শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা। পারস্পরিক দ্বন্দ্বে—গৃহবিবাদে—ক্রমে হিন্দু-মুসলমান উভয় শক্তিই অবসন্ন হইয়া পড়ে।

এই রাজনৈতিক দুর্যোগের সুযোগেই—"আসিল বণিকলক্ষ্মী সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে রাজসিংহাসন"—"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে"—তাহাতে ইংরেজ-রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মহাদুর্যোগই ইংরেজের পক্ষে মহা সুযোগ। বাদশাহের শাসন অটুট ও প্রবল থাকিলে, গৃহ-বিবাদে শক্তিগুলি শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ব্যতিব্যস্ত না থাকিলে বণিককে 'মান-দণ্ড' লইয়াই কুর্ণিশ করিতে করিতে জীবন কাটাইতে হইত। ভাগ্য তাঁহাদের সুপ্রসন্ন। ভারতের রাজনৈতিক আকাশ ঘন-দুর্যোগে পূর্ণ হইয়া যায়। অন্তর্বিপ্লবে ও বহিরাক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন ও বিপর্যস্ত ভারত, বণিক লক্ষ্মীর পক্ষে সুড়ঙ্গ পথ খননের অনুকূল হয়। গৃহবিবাদের সুযোগ লইয়া, বা গৃহ-বিবাদে উসকানি দিয়া বৈদেশিক বণিকগণ নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে এবং প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। প্রথমতঃ কর্ণাটক ও হায়দরাবাদের গৃহ-বিবাদকে কেন্দ্র করিয়া ফরাসী ও ইংরেজের শক্তিপরীক্ষা বা প্রতিযোগিতা ব্যক্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় চেষ্টা দেখা দেয়—বঙ্গদেশে—সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায়। ছলে-বলে কৌশলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই ষড়যন্ত্রের পরিণাম—পলাশী-প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় তথা ইংরেজ বণিকের সামরিক জয় ও প্রতিষ্ঠা এবং তাহার ফলে ক্রমে 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে'। সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস এই কারণেই—যুগ-সন্ধির ইতিহাস—ইংরেজ-নামক বৈদেশিক জাতির কাছে পরাজয়ের ও আত্মসমর্পণের ইতিহাস। সিরাজদ্দৌলা এই হিসাবে আলিবর্দীর দৌহিত্র বা সামান্য 'একজন' নবাব মাত্র নহে—সিরাজদ্দৌলা বৈদেশিক ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিযোদ্ধা; সিরাজ শুধু একজন ব্যক্তি নহেন—সিরাজ একটা যুগের শেষ প্রতিনিধি। বলা যাইতে পারে—ভারতের সিংহাসন, ইংরাজেরা সিরাজদ্দৌলার বক্ষঃপঞ্জর হইতেই ছিনাইয়া লইয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধ শুধু মাত্র গৃহযুদ্ধ নহে, অত্যাচারী বা দুর্বিনীত কোন নবাবকে পদচ্যুত করিবার জন্য ক্ষমতাশালী আমির ওমরাহদের সশস্ত্র

বিদ্রোহ নহে—পলাশী বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের ও বাংলার স্বাধীনতার সমাধিক্ষেত্র, বৈদেশিক শক্তির কাছে স্বাধীনতা বিক্রয়ের কালো বাজার—ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূতিকাগার।

এই কারণেই—ইংরেজশাসনাধীন হিন্দু-মুসলমানের চোখে পলাশীর-যুদ্ধ বাংলার স্বাধীনতারক্ষার যুদ্ধের সহিত—সিরাজদ্দৌলার পরাজয় বাঙলার তথা ভারতের পরাজয়ের সহিত ও স্বাধীনতা হারানোর বেদনার সহিত এক হইয়া গিয়াছে। একথা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে **হিন্দু-মুসলমানের-দেশ ভারতবর্ষের পরতন্ত্রতার ইতিহাসের ভূমিকা পলাশীর প্রান্তরে মীরমদন-মোহনলালের রক্তে—সিরাজদ্দৌলার রক্তে রচিত হইয়াছে।** ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও ভারতবাসী সিরাজদ্দৌলাকে এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন—ঐতিহাসিকদের অনেকেই সিরাজকে এই উজ্জ্বল বর্ণেই অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। সিরাজদ্দৌলার এই **রাজনৈতিক তাৎপর্য্য খুবই লক্ষণীয়।**

নানা দৃষ্টিকোণে সিরাজ

এ কথা অবশ্য সত্য—সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা—কি দেশী কি বিদেশী—সিরাজদ্দৌলার চরিত্র গাঢ় কালিমায় লিপ্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। বিরুদ্ধপক্ষীয় গোলাম হোসেন সাহেবের কথায় বিশ্বাস না করিলেও নিষ্কৃতি নাই, কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠিয়াল মঁসিয়ে লা (Jean Law) —যিনি সিরাজের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—তিনি পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন—"The character of Siraj-ud-daulah was reputed to be one of the worst ever known. In fact he had distinguished himself not only by all sorts of debaucheries, but by a revolting cruelty. The Hindu women are accustomed to bathe on the bank of the Ganges. Siraj-ud-daulah, who was informed by his spies which of them were beautiful, sent his satellites in little boats to carry them off. He was often seen, in the season when the river overflows causing the ferry boats to be upset or sunk, in order to have the cruel pleasure of seeing the confusion of hundred people at a time, men, women and children...... Every one trem-

bled at the name of Shiraj-ud-daulah"—সিরাজের চরিত্র বিদেশী কুঠিয়ালরা অনেকক্ষেত্রেই অপ্রকৃতি সহকারে লিখিয়া গিয়াছেন। অন্যদের সময় নানা মনোভাব তাহাদের মধ্যে যে কাজ করিয়াছে সে বিষয়েও সন্দেহ করা চলে না। তবে সিরাজকে একেবারে ধোয়া-তুলসী প্রমাণ করিবারও কোন কারণ নাই। আর যাহাই সত্য হউক আর [redacted] হউক সিরাজের নামে অনেকেরই হৃৎকম্প হইত—বিশেষতঃ বিদেশী কুঠিয়ালদের যে হইত, তাহার প্রমাণ আছে! তারপর, চুল-চেরা ও গভীর গবেষণার আলোকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চিত্রটি খুব চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে নাও হইতে পারে। হিন্দু-জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে—মুসলমান-অধিকারে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা আচ্ছন্ন ও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে—হিন্দু-সমাজ কোণঠাসা পরাধীন জীবন যাপন করিয়াছে, হিন্দু-সম্প্রদায়ের জীবন-যাত্রা, মুসলমান শাসকগণের অনুকম্পার আশ্রয়ে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনও প্রকারে টিকিয়া আছে—মুসলমানের বিজয়ীর অভিমান, হিন্দুর বিজিতের দৈন্য। (অবশ্য মানসিংহ রাজবল্লভ, জগৎশেঠাদি প্রসাদজীবীদের কথা সবযুগেই স্বতন্ত্র।) হিন্দু-জাতির অভিমান লইয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে—মুসলমান শাসনের অবসান, হিন্দু-সংস্কৃতির পক্ষে রাহু-গ্রাস হইতে মুক্তি—হিন্দু-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের শুভ-লগ্ন—তখনই উপস্থিত। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসকে অবশ্যই তাহার বড় প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা যাইতে পারে। ১৭৫৭ পর্য্যন্ত মুসলমান-শাসন অব্যাহত থাকিলে, সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিন্যাসের রূপ যাহাই হউক, হিন্দু-সংস্কৃতির দুর্ভোগ বাড়িত বই কমিত না। অবশ্য যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য আমরা ইংরেজ-আমলে মাথা কোটাকুটি করিয়াছি এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐক্য আনিতে না পারিয়া জিন্নার দ্বিজাতিবাদকে কার্যতঃ স্বীকার করিয়াছি, সেই ঐক্য আন্দোলনের কোন প্রয়োজন হয়ত থাকিত না। হিন্দু-কূল ভাসিয়া মুসলমান-কূল গড়িয়া উঠিত। এইরূপ দৃষ্টিতেও অনেক ঐতিহাসিক মুসলমান যুগকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ

সরকার মহাশয় সিরাজদ্দৌলার পতনকে 'ভারতের চির অমানিশা' বলিয়া স্বীকার করেন নাই—"Sadists like Siraj" প্রভৃতির শাসন হইতে দেশ মুক্ত হইয়াছে—ইহাতে তিনি যেন আনন্দিত, তাঁহার কাছে—"In june, 1757 we crossed the froutier and entered into a great new world... "অধিকন্তু" it was the beginning, slow and unperceived, of a glorious dawn ·····On 23 June, 1757, the middle ages of India ended, and her modern age began"

নব জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ

সত্য বটে—ঐতিহাসিক সরকারের পক্ষে, ইতিহাস এই অপ্রিয় সত্যের সমর্থন করিয়াই সাক্ষ্য দিতে পারে এবং শেষ বিচারে হেতুঃ এই অপ্রিয় সত্যই জয়ী হইতে পারে, কিন্তু যে দৃষ্টি সিরাজদ্দৌলাকে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের ও বাংলার স্বাধীনতা-রক্ষকের মর্যাদা দিয়াছে, সে দৃষ্টিকেও একেবারে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর কবি যাঁহাকে মহাকাব্যের নায়ক রূপে নির্বাচন করিতে দ্বিধা করেন নাই, তিনি যে বাঙালীর হৃদয়ে আগেই সহানুভূতির আসনখানি অধিকার করিয়াছেন তাহা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য—ব্রিটিশের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হওয়ার পরে হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে নিজেদের দৈন্য ও অবস্থা উপলব্ধি করিতে থাকে এবং সেই উপলব্ধি হইতেই স্বাধীনতালাভের জন্য, বৈদেশিক শক্তির শাসন হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রেরণা লাভ করে। ইংরেজ-বিদ্বেষ বা ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব তখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই—কোথাও ব্যক্ত কোথাও অব্যক্ত। স্বাধীনতাকামী হিন্দু-মুসলমান মাত্রেই তখন এই ধারণার বশবর্তী যে পলাশী-যুদ্ধে—পরাজয় হইতেই জাতির পরাধীনতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে, পলাশীতেই আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি; সিরাজদ্দৌলা পলাশী-যুদ্ধের নায়ক, সুতরাং স্বাধীনতারক্ষার সংগ্রামের নায়ক—তথা জাতিরই নায়ক। সিরাজের চরিত্র ভাল ছিল না, তাহা সত্য—তবে নবাব হওয়ার পরে চরিত্র মন্দ করিবার মত সময়টুকুও তিনি পান

নাই—ইহাও একেবারে মিথ্যা নহে ; আর সর্বাপেক্ষা বড় সত্য এই যে সিরাজ বৈদেশিক বণিক—ফিরিঙ্গীদের সুনজরে দেখেন নাই এবং আলিবর্দীর চোখ দিয়া উঁহাদের স্বরূপ ভাল করিয়াই চিনিয়াছিলেন। পরাধীনতার পটভূমিতে, ফিরিঙ্গী-বেষী সিরাজের এই চিত্র স্বাভাবিকভাবেই যে উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হইবে জাতীয় বীর-যোদ্ধার মর্যাদা লাভ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাও ঐতিহাসিক সত্য—ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তা-বোধের নবজাগরণের দিনে, দেশবাসীর নূতন উপলব্ধির কাছে, সিরাজদ্দৌলা স্বাধীন বাঙলার শেষ নবাব, সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ-জাতির প্রধান শত্রু—দেশদ্রোহী হিন্দু-মুসলমান সামন্তদিগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। প্রায় সকলেরই ধারণা—দেশের শাসনাধিকার যাহাতে বিদেশী জাতির হস্তে না চলিয়া যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থ—দেশের স্বার্থ যাহাতে বিসর্জিত না হয় এই জন্যই সিরাজ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সিরাজের চেষ্টা সফল হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সাধনার মহিমা অস্বীকার করিতে পারে—শুধু ঐ মিরজাফরের বংশধরেরাই। *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সিরাজকে এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন।

এই কারণেই, সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেকখানি। স্বাধীনতা-কামী বাঙালী বা ভারতবাসীর মনে সিরাজের নাম আর আতঙ্কের বা ঘৃণার উদ্রেক করে না, সিরাজদ্দৌলা কথাটিতে আজ নূতন শক্তিগ্রহ ঘটিয়াছে—নূতন ও গভীর ব্যঞ্জনা যুক্ত হইয়াছে। বাঙলা শুধু হিন্দুর নহে, বাঙলা শুধু মুসলমানের নহে—বাঙলা বাঙালীর—এই নব-জাতীয়তার প্রধান উদ্গাতার মহিমাই সিরাজ কথাটিকে ঘিরিয়া আছে। নবজাতীয়তা-বাদীর কাছে সিরাজ বলিতে—এক সঙ্গে মনে আসে পলাশীর প্রান্তরের জাতিদ্রোহীদের দেশ-বিক্রয়ের কালো ষড়যন্ত্র, বিদেশী বণিকের ছল-বল-কৌশলের হীন আচরণ—এই সকলের বিরুদ্ধে অসহায় সিরাজের নিষ্ফল ও নিরুপায় সংগ্রাম এবং—অতি করুণ পরিণাম, ক্লাইভের জয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিস্থাপনা—পরাধীনতার সূচনা। * যদিও-মুসলিম লীগের দ্বিজাতি-বাদের আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের ফলে দেশ বিভাগ,

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-বোধে ফাটল সৃষ্টি করিয়াছে—হিন্দু-মুসলমান সমবায়ে জাতি গঠনের ধারাকে ব্যাহত ও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে, ইহাও সত্য—বাংলার স্বাধীনতার জন্য মীরমদন-মোহনলালের প্রাণোৎসর্গ সিরাজের প্রাণপণ সংগ্রাম, সাময়িক দুর্যোগে আচ্ছন্ন হইলেও, স্বকীয় মহিমা কোন কালেই হারাইবে না। যতদিন বাংলা ও বাঙালী, ততদিন সিরাজ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, **যতদিন বাংলা হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি ততদিন সিরাজ বাংলার অন্যতম জাতি—প্রতিনিধি।**

সিরাজদ্দৌলার রাজত্বের আর্থ-রাজনৈতিক পটভূমি

সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসকে আমরা এক হিসাবে নবাব আলিবর্দীর ইতিহাসেরই 'পরিশিষ্ট' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল আলিবর্দীর মৃত্যু আর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই সিরাজদ্দৌলার হত্যা—মোট পনেরো মাসের নবাবীর ইতিহাস। এই কারণেই রাজনৈতিক কয়েকটি ঘটনা বাদ দিলে, সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসের পটভূমি এবং আলিবর্দীর পটভূমি প্রায় একই। প্রথমে এই পটভূমিরই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাউক।

সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি

পূর্বেই বলা হইয়াছে—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় ইতিহাস, জাতি-দ্বন্দ্ব ও সামন্তবর্গের প্রতিযোগিতায় ও বিদ্রোহে বিক্ষুব্ধ। মোগল-বাদশাহের সহিত উত্তর ভারতীয় রাজপুত জাঠ ও শিখের এবং দক্ষিণ ভারতীয় মারাঠা জাতির সংগ্রামে জাতি-দ্বন্দ্বের উৎকট রূপটি প্রকাশ পায় এবং সুবাদারদিগের স্বাধীনতা ঘোষণায় বা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তি চরম রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে হিন্দু ও মুসলমান সকল সামন্ত-শক্তিই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করে কিন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে সবগুলিই ক্রমে-ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্বলতার ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়াই বিদেশী বণিক কম্পানীগুলি নিজেদের

আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। কেন্দ্রের এই দুর্বলতার সুযোগেই, মহম্মদ শাহের রাজত্বকালেই আলিবর্দী কার্য্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন এবং বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি হইয়া বসেন। **আলিবর্দীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—**

আলিবর্দীর পরিচয়

আলিবর্দী জাতিতে তুর্ক-আরব। তাঁহার পিতামহ—জনৈক মোগল মনসবদার এবং পিতা—ঔরংজীবের তৃতীয়পুত্র আজম শাহের 'পাত্র-বাহক'। আলিবর্দী নিজে প্রথম জীবনে—পিলখানার (হাতীশালা) এবং 'জাহদোজ্‌খানা'র (জরিদার বস্ত্রাদির) অধ্যক্ষ এবং ক্রমে অধ্যবসায় ও বুদ্ধি-কৌশলের প্রভাবে এবং সুজা-উদ্-দিনের প্রসাদে—১৭২৮ খৃঃ রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছিলেন—'আলিবর্দী' উপাধিটি। আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহ্‌মদ সুজা-উদ্-দীনের প্রধান পরামর্শদাতারূপে মুর্শিদাবাদে ছিলেন। হাজির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ-রজা (আলিবর্দীর বড় জামাতা) হইলেন—নবাবফৌজের 'বক্সী' ও শুল্কবিভাগের অধ্যক্ষ, দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ সঈদ (মধ্যম জামাতা) হইলেন—রংপুরের ফৌজদার এবং কনিষ্ঠ মীর্জা মহম্মদ হাসিম (পরে জৈনদ্দিন ও ছোট জামাতা—সিরাজের পিতা) লাভ করিলেন—'খান' উপাধি। ১৭৩৩ খৃঃ আলিবর্দীর কপাল খুলিল। বিহার বাঙলা সুবার সহিত যুক্ত হইলে আলিবর্দী বিহারের সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। সুজা-উদ্-দৌলার অনুরোধে বাদশাহ তাঁহাকে 'মহাবৎজঙ্গ' উপাধি দিলেন, 'পাঁচ হাজারী মনসাদার' করিলেন এবং পাল্‌কী ও শাস্তা ব্যবহারের অধিকারও দিলেন। ক্রমে নাদিরশাহের আক্রমণের দুর্যোগকে মহাসুযোগে পরিণত করিয়া দুর্ব্বল সরফরাজের হস্ত হইতে তিনি 'বাঙলা' ছিনাইয়া লইলেন (গিরিয়া-যুদ্ধ—১৭৪০, ৯ই এপ্রিল)। ভ্রাতুষ্পুত্র (বড় জামাতা) নোয়াজেস্ মোহম্মদকে খাস্‌তালুকের দেওয়ান এবং ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন—হোসেনকুলিকে করিলেন তাঁহার সহকারী; (সিরাজদ্দৌলার পিতা) জৈনুদ্দিনকে বিহারের সহ-শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, মীর-মহম্মদ জাফর খাঁকে করিলেন—পুরাতন ফৌজের বক্সী, চিন রায় হইলেন,

সেনাপতির ও বাংলার দেওয়ান—জানকীরাম হইলেন—সর্ব-বিষয়ের দেওয়ান—প্রধান; গোলাম হোসেন হইলেন—"হাকিম"। এইভাবে শাসন-ভার বন্টন করিলেন। তারপর, ১৭৫১ খৃঃ উড়িষ্যাতে আধিপত্য বিস্তৃত হইলে, দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁনকে (সৌলৎজঙ্গ) উড়িষ্যার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু আলিবর্দী স্বস্তিতে রাজ্যাধিকার ভোগ করিতে পারেন নাই। বৈদেশিক শক্তির বার বার আক্রমণে কেন্দ্র দুর্বল হওয়ায় প্রদেশে স্বাধীনভাবে কার্য্য করার সুবিধা হইলেও, দাক্ষিণাত্যের মারাঠা-শক্তির অভিযান আলিবর্দীর আহার নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছিল। (প্রথম মারাঠা-অভিযান ১৭৪২, দ্বিতীয়—১৭৪৩, তৃতীয়—১৭৪৪)। আফগান-বিদ্রোহ ও (১৭৪৫) তাঁহাকে কম যন্ত্রণা দেয় নাই। ১৭৫১ খৃঃ সন্ধি-প্রস্তাবপত্র স্বাক্ষরিত হইলে আলিবর্দী একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পান। এই সকল যুদ্ধের ফল আলিবর্দীর জীবনে শুভ হয় নাই। যুদ্ধের ব্যয় ভার বহন করিতে তিনি জমিদার-জায়গীরদার, বণিক-সম্প্রদায় সকলের নিকট হইতেই অর্থ আদায় করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অসন্তোষও কুড়াইয়াছিলেন (১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অধিকন্তু, যাহাকে বলে 'ঘর ঠিক করা' তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই। জমিদার জায়গীরদারদিগের অসন্তোষ আর ঘরের এক কোণে আগুন রাখিয়া যাওয়া—একই কথা। কারণ আলিবর্দী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হইলেও এবং ন্যায়তঃ তিনটি প্রদেশেরই হর্তাকর্তা-বিধাতা হইলেও বস্তুতঃ দেশের ভূ-সম্পত্তি, কয়েকজন ভূম্যধিকারীর অধিকারেই ছিল এবং তাঁহারাই ছিলেন দেশের প্রকৃত মালিক। প্রজার সহিত প্রত্যক্ষযোগ ছিল এই ভূস্বামিগণেরই আর এই সকল ভূস্বামীরা ছিলেন এক একজন খুঁদে-নবাব। মোগল-অধিকারের শেষ দিকের বাঙ্গলার জমিদার-বর্গের পরিচয়, ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাঙ্গলার ইতিহাস' হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখান যাইতে পারে। এই গ্রন্থে—এই সময়কার জমিদার-বর্গকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে :—

(১) প্রাচীন কালের স্বাধীন বা করদ হিন্দু-রাজগণঃ—

(২) হিন্দু বা মুসলমান ফৌজদারগণঃ—

(৩) পূর্ব্বতন রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী, তালুকদার এবং অন্য অর্থশালী ব্যক্তিগণ।

মুর্শিদ কুলি খাঁ ১৭২২খৃঃ সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৩ চাকলায় বিভক্ত করিয়া সেই গুলিকে ২৫ জমিদারি ও ১৩ জায়গীরে বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত পত্র হইতে ('জমা কামেল তুমারী') দেখা যাইবে যে বাঙ্গলা দেশের জমিদারেরা অনেকস্থলেই উত্তরাধিকারক্রমে জমিদারি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। জমিদারির তালিকা—

(ক) ত্রিপুরা (৪ পরগণা) (পাঠান আমলে স্বাধীন, শাজাহানের সুবাদারি আমলে ও মুর্শিদ কুলি খাঁর সময়ে বশ্যতা স্বীকার করে) (খ) পঞ্চকোট—(২) (ক্ষত্রিয় রাজপুত বংশ)—মোগল আমলে বশ্যতা (গ) বিষ্ণুপুর—(২) (রাজপুত ক্ষত্রিয় বংশ)—৮ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত (ঘ) বর্দ্ধমান—(৫৭) (কপুর ক্ষত্রিয় বংশ)—সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত (ঙ) দিনাজপুর—(৮৯) (কায়স্থ বংশ)—শ্রীমন্ত চৌধুরী (শাজাহানের সময়) (চ) নবদ্বীপ—(১৩) প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার (ছ) রাজশাহী (নাটোর) (১৩৯)—(১৭২৫ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত) (জ) বীরভূম—(২২) (মুসলমান জমিদারী) (ঝ) ইউসুফপুর (যশোহর) (২৩)—কায়স্থ ভবেশ্বর রায় (মানসিংহকে সাহায্যের প্রতিদান) (ঞ) লস্করপুর—(পুঁটিয়া) (১৪)—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (ট) কঙ্কনপুর—কানুনগো (৬২)—(ঔরংজীবের সময়ে) (ঠ) ফতেসিংহ—(১১)—জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বংশীয় (মানসিংহের সময়ে) (ড) মহমুদশাহী—(ভূষণা) (২৯)—সীতারাম (ঢ) ইদ্রাকপুর—(ঘোড়াঘাট) (৩০)—কায়স্থ বংশীয় (১৬৬৯)—রঘুনাথ (ণ) আলাপপুর—(১৫৫) (ত) শেরপুর—(পূর্ণিয়া) (১৩)—(মুসলমান) (থ) কলিকাতা—(২৭)—(দ) ফকিরকুণ্ডী—(রঙ্গপুর) (ধ) কাঁকজোল—(রাজমহল) (১০)

(ন) জমোলুক—(মহিষাদল) (১৬)—(ষোড়শ শতাব্দীতে—জনার্দন) (প) শ্রীহট্ট—(৩৬) (ফ) ইসলামাবাদ—(চট্টগ্রাম) (ব) সন্দ্বীপ ও খোন্তাঘাট (ভ) মজকুরী তালুক (২১ তালুক) (ম) সায়রাৎ মহাল

হিন্দু-প্রভাব

এখন, উল্লিখিত জমিদারী-বন্দোবস্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বাংলা দেশের ভূ-সম্পত্তির উপর জমিদার-জায়গীরদারগণেরই প্রত্যক্ষ আধিপত্য ছিল এবং জমিদারগণের দ্বারাই দেশের আর্থ-নৈতিক তথা রাজ-নৈতিক—জীবন অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত হইত। আর বিশেষভাবে যাহা চোখে পড়ে তাহা এই যে—জমিদারদিগের মধ্যে অনেকেই হিন্দু, ধনে-জনে খুবই প্রতিপত্তিশালী এবং অনেকেই—পাঠান-মোগলের শক্তি-পরীক্ষার উপদ্রবের মধ্যেও নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সকল জমিদার-জায়গীরদারেরাই নবাবের জনবলের ধনবলের উৎস তথা প্রধান সহায়। এই কারণেই নবাবের ইতিহাসে জমিদার-জায়গীরদারগণের একটা অংশ—বড় অংশ—না থাকিয়াই পারে নাই। নানা শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে জমিদার-শক্তি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আলিবর্দ্দীর সময়েই আমরা দেখি, আলিবর্দ্দীর হিন্দুবিদ্বেষ না থাকিলেও এবং তাঁহার দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যে হিন্দুরা উচ্চপদে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও হিন্দু জমিদারেরা আলি-বর্দ্দীকে একটি কারণে সুনজরে দেখিতে পারেন নাই—কারণটি বোধহয়, "আবওয়াব"—আদায়। ফুটির ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল স্কট তাঁহার বন্ধু নোবলকে ১৭৫৪ খৃঃ লিখিয়াছিলেন—"the Jentue (Hindu) rajas and the inhavitants were disaffected to the moor (Muhammadan) government and secretly wished for a change and opportunity of throwing off their yoke" হিন্দু জমিদারেরা তলে তলে আলিবর্দ্দীকে অপসারিত করিবার জন্ত গোপন বাসনা পোষণ করিতেছিলেন—সিরাজদ্দৌলার সময়ে সেই বাসনা প্রচণ্ড ষড়যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল।

দেশীয় হিন্দুবণিক ও ইউরোপীয় বণিক কম্পানী

তারপর—কৃষি-রাজস্বের সংগ্রাহক বলিয়া জমিদারগণ যেমন নবাবের এবং দেশের ধনবলের আধার, তেমনি ধনবলের অন্যতম উৎস ছিল বণিক-সম্প্রদায়, (কারণ বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস—কাচা টাকা বণিকের ঘরেই বেশী)। শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়ই যে নবাবের প্রধান কোষাগার—জগৎ শেঠের ঐতিহাসিক গুরুত্বই তাহার বড় প্রমাণ। এই বাণিজ্য-ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছাড়াও, বৈদেশিক বণিক সম্প্রদায়ের আধিপত্য-বিস্তার—বিস্তারের অধিকতর চেষ্টা এবং আধিপত্যকে সুরক্ষিত করিবার জন্য রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ, দেশের আর্থনৈতিক সংস্থাটিকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল। মোটকথা বিদেশী বণিকরাও তখন একটা শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সেইকারণেই উহারা আর্থনৈতিক সংস্থার বা পটভূমির অন্যতম লক্ষণীয় অংশ হিসাবে গণ্য। আলিবর্দ্দির সময়েই ইউরোপীয় বণিকরা দাক্ষিণাত্যে গৃহ-বিবাদে মাথা গলাইয়া ক্ষমতা বৃদ্ধির যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতে আলিবর্দ্দী খুবই ভাবিত হইয়াছিলেন এবং বিদেশী বণিকগণের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখিতেন। কলিকাতায় বা চন্দননগরে তিনি ইংরেজ বা ফরাসী বণিককে দুর্গ নির্মাণ করিতে দেন নাই। প্রস্তাব আসিলেই বলিতেন—"তোমরা এসেছ বাণিজ্য করতে এ দুর্গের দরকার কি? আমার অধীনে যতক্ষণ আছ ভয়ের কোন কারণ নেই।" আলিবর্দ্দীর কড়া শাসনে টুঁশব্দ করিতে না পারিলেও মনে মনে ইংরেজ বণিকরা খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী, ইংরেজ-বণিকদিগকে মারাঠাদের সাহায্য করিতে দেখিয়া অভিযোগ তুলিয়াছিলেন—এবং গুরুতর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, বিষয়টি এই—আগে কম্পানীর জাহাজ ছিল মাত্র ৪।৫ খানা, এখন সেখানে জাহাজের সংখ্যা ৭০।৮০, আর উহাদের সবগুলি কম্পানীর জাহাজ ছিল না। ইংরেজরা যে তলে তলে বড় একটা কিছু করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল আলিবর্দ্দীর সময়েই তাহা বুঝা গিয়াছিল। সিরাজের সময়ে এই কালসাপেরাই ফণা তুলিয়া দংশন করিতে আরম্ভ করিল।

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পরে (১৭৫৬) সিরাজদ্দৌলা উত্তরাধিকার-সূত্রে শুধু

সিংহাসনখানিই লাভ করেন নাই, সিংহাসনের চতুর্দিকে যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বারুদস্তূপটি জমিয়া উঠিয়াছিল তাহাও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গৃহ-বিবাদের অনিবার্য বিস্ফোরণ দেখিতে না দেখিতেই দেখা দিল। একদিকে বড়মাসী ও জেঠিমা ঘসেটি বেগম এবং তাঁহার আশ্রিত রাজবল্লভ প্রভৃতি ক্ষমতাশালী জমিদারবর্গ, অন্যদিকে জেঠতুতো মাসতুতো-ভাই পূর্ণিয়ার নবাব সওকৎ জঙ্গ ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ—সুযোগলোভী ও সিরাজ-বিদ্বেষীরা ঐ দুই পক্ষের কোনও এক পক্ষে ভর করিয়া গৃহ-বিবাদে বাতাস দিতে থাকিলেন। জমিদারগণ ও বণিকগণ নিজের স্বার্থরক্ষার দিকেই একমাত্র নজর রাখিয়া বাংলার স্বাধীনতাকে বিদেশীর কাছে বিকাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিলেন না।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়াছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে আলিবর্দী খাঁ শোথ ও উদরী রোগে শেষ শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে সিরাজ রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই সময়েই—বারুদের স্তূপ বিস্ফোরণ-মুখী হইয়া উঠিতেছিল। রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, প্রমুখ জমিদারবর্গ রাজস্ব ফাঁকি দিয়া আসিতেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে একাধিকবার বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে কাটাইতে হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে আলিবর্দী ও সিরাজ-বিদ্বেষ অন্যায় হইলেও অস্বাভাবিক ছিল না। রাজবল্লভও ঢাকার রাজস্ব লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছিলেন। হোসেন কুলির মৃত্যুর পর (১৭৫৪, এপ্রিল) রাজবল্লভ ঢাকার নবাবের দক্ষিণ হস্ত হইলেন। নৌবহর সংগঠনের জন্য ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, অধ্যক্ষ রাজবল্লভ মহাশয় তাহা আত্মপুষ্টির জন্যই বেশী ব্যয় করিতেন। নোয়াজিস মহম্মদ পঙ্গু থাকায় হোসেন কুলি যত সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিলেন, বৈদ্য-চতুর রাজবল্লভ তাহার সব কয়টি ভোগ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক অর্মকে বিশ্বাস করিলে—স্বীকার করিতে হইবে "বেগমের সহিত রাজবল্লভের অনুরূপ সম্বন্ধও লোকে সন্দেহ করিত যাহা একের উক্ত পদ ও অপরের ধর্মের অনুযায়ী নহে"। অবশ্য ঐতিহাসিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

পাদটীকায় জানাইয়াছেন—"ঘসেটি বেগমের চরিত্র হোসেন-কুলী-প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে। পরে মির নবাব আলিকে সু-নজরে রাখায় বৃদ্ধ রাজবল্লভের ষড়যন্ত্রে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ আছে"। যাহা হউক, শাহামৎ জঙ্গের (নোয়াজিস্) মৃত্যুর পরে (১৭৫৫, ডিসেম্বর), সিরাজ রাজবল্লভের ঢাকা-শাসনের হিসাব-নিকাশ করিতে বলিলেন—এই কারণেই ১৭৫৬ মার্চমাসে রাজবল্লভ কারারুদ্ধ হইলেন। আলিবর্দীর কৃপায় রাজবল্লভের মাথাটি সে যাত্রা স্কন্ধদেশেই রহিয়া গেল, কিন্তু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও পরিবারকে বন্দী করিতে লোক প্রেরিত হইল। অবশ্য রাজবল্লভ পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে ধনজন সহ জগন্নাথ দর্শনের অছিলা করিয়া ওয়াটসের সাহায্যে কলিকাতায় ইংরেজ দুর্গে সরাইয়া দিয়াছিলেন (১৩ই মার্চ ১৭৫৬)*। কৃষ্ণবল্লভের কলিকাতায় পৌঁছিবার এবং আশ্রয় পাইবার সংবাদ পাইয়া সিরাজ বুঝিয়াছিলেন—আলিবর্দীকেও বলিয়াছিলেন—ইংরাজ ঘসেটি বেগমের পক্ষই অবলম্বন করিবে। কলিকাতায় গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন এবং গুপ্তচর বিতাড়িত হইলে (১৭ই এপ্রিল) ইংরেজের স্পর্ধার মাত্রাও বুঝিয়া লইলেন। কিন্তু অবস্থা তখন ঘোরালো। (এই মাসেই আলিবর্দী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) অন্যদিকে ঘসেটিবেগমও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। পালিতপুত্র একরাম-উদ্দৌলার (সিরাজের ছোট ভাই) ও স্বামীর মৃত্যুর পরে, একরামের শিশু-পুত্রকে মসনদে বসাইবার কল্পনায় মন্ত্রণা আঁটিতে লাগিলেন—সহায় ছিল তাঁহার রাজবল্লভ ও অনুগত সেনানীদল।

আলিবর্দীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, রাজবল্লভ-মীরজাফর-ঘসেটিবেগম-শওকৎজঙ্গ ও ইংরেজবণিকের মধ্যে—ঢাকা-পূর্ণিয়া-কলিকাতা জুড়িয়া একটি সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র-বলয় সৃষ্টি হইল। ঐতিহাসিক সরকারের ভাষায় বলা চলে "Thus Sirajud daulah came to his long assigned throne in a house divided against itself, with a hostile faction in the army and disaffected subject population'

আলিবর্দীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফর শওকৎজঙ্গকে বাঙলা অধিকার

করিবার জন্য গোপন পত্রে আহ্বান জানাইলেন এবং নিজের ও অন্যান্য সেনানীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। শওকৎজঙ্গও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। দিল্লী হইতে বাদশাহী ফরমান আনাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

রাজ্যপ্রাপ্তির পরে সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস

ঘসেটি-বেগমকে মতিঝিল হইতে অপসারণ

সিরাজদ্দৌলা প্রথমেই ষড়যন্ত্রের বড় ঘাঁটি নষ্ট করিবার জন্য মতিঝিলের আড্ডা ভাঙিয়া দিলেন—ঘসেটি বেগমের ধনরত্ন হস্তগত করিলেন এবং ঘসেটিকে মতিঝিল হইতে সরাইয়া লইয়া আসিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। ঘসেটির প্রিয়পাত্ররা (নজর আলি প্রভৃতি) 'যঃ পলায়তি'-নীতি প্রয়োগ করিয়া নীতিটির কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিলেন। তবে সব ধনরত্ন সিরাজের হস্তগত হইল না। মুতাক্ষরীণকারের মতে—"বিশ্বস্তা দাসীর সাহায্যে অনেক স্বর্ণমুদ্রা স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সময়, চক্রান্তকারিগণের সহিত যোগ দিয়া ইহার ব্যবহার করা হয়"। স্বার্থান্বেষী ও ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফরকে তিনি 'বক্সী' পদ হইতে সরাইয়া মীরমদনকে 'বক্সী' পদ দান করিলেন এবং কাশ্মীরী মোহনলালকে দেওয়ান-খানার পেস্কার পদ এবং মহারাজ উপাধি দিলেন। মোহনলাল কার্য্যতঃ প্রধানমন্ত্রীর স্থান গ্রহণ করিলেন—(এপ্রিল ১৭৫৬)—'দেওয়ান ই-আলা' মোদর-উল-মোহম্ (প্রধানমন্ত্রী) হইলেন।

১৬ই মে হইতে ২২শে মের ঘটনা

১৭৫৬, মে মাসে সিরাজ শৌকৎজঙ্গকে দমন করিবার জন্য পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। ২২শে মে, শৌকৎজঙ্গ বশ্যতা স্বীকার করিয়া পত্র পাঠাইলে, সৈন্যসহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। কারণ আর একদিকে বিপদ বেশ ঘনাইয়া উঠিতেছিল—ইংরাজ বণিকের স্পর্দ্ধা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।

(৬) সিরাজের সহিত ইংরাজের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ইংরাজ বণিকদিগের প্রতি সিরাজের মনোভাব একে ভাল ছিল না। তদুপরি কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেওয়ায় এবং আদেশ অমান্য করিয়া দুর্গ মেরামত করায় তাহা

ক্রোধেই পরিণত হইল। সিরাজ-প্রেরিত চরের অপমানে ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। ২৪শে মে কাশিমবাজার কুঠি আক্রান্ত হইল—কুঠিয়ালরা অনেকেই বন্দী হইলেন। ৫ই জুন কলিকাতা-অভিযানে যাত্রা করিলেন। ১৬০ মাইল পথ ১১ দিনে অতিক্রম করিয়া ১৬ই জুন কলিকাতায় পৌঁছিলেন। ১৮ তারিখে রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ১৯ তারিখে সাহেবদিগের সঙ্কট চরমে পৌঁছিল; হলওয়েল সাহেব (J. Z. Holwell) সেনাপতি সাজিলেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সাহেবদের আতঙ্ক ও পলায়ন বন্ধ করিতে পারিলেন না। হলওয়েল, বেলা চার ঘটিকায় আত্মসমর্পণ করিলেন এবং নবাব সিরাজদ্দৌলা বিজয়গর্বে কলিকাতায় প্রবেশ করিলেন। "সেনাপতি মীরজাফর খাঁ ও অন্যান্য পাত্রমিত্র সঙ্গে অপরাহ্ন পাঁচটার পরে নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ-দুর্গে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই কৃষ্ণবল্লভ ও আমিচাঁদের সন্ধান হইল; তাহার সম্মুখে আনীত হইলে, নবাব তাঁহার প্রতি সমাদর ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণবল্লভকে এক শিরোপা প্রদত্ত হইল" (বন্দ্যোপাধ্যায় Cook'es Evidence.)

(৫) এদিকে সওকৎজঙ্গ দিল্লী হইতে বাদশাহী উজিরকে এক কোটি টাকা ঘুষ দিয়া, বাংলা-বিহার উড়িষ্যা অধিকার করিবার অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিলেন এবং সিরাজ-প্রতিনিধি রায় রাসবিহারীকে ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—সিরাজ যেন মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া ঢাকায় গিয়া বাস করে। অগত্যা সিরাজকে ২৪শে সেপ্টেম্বর সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেই হইল। মণিহারী-যুদ্ধে ১৬ই অক্টোবর সওকৎজঙ্গ প্রাণ দিয়া নবাবী মানটুকু বাঁচাইয়া গেলেন।

(৬) কলিকাতায় ও পূর্ণিয়ায় জয় লাভ করিয়া এবং বাদশাহী সনন্দ লাভ করিয়া সিরাজ একটু নিশ্চিন্ত হইলেন এবং আশা করিলেন ইংরেজরা এবার আত্মসমর্পণ করিয়া—বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকিবে কিন্তু ডিসেম্বর মাসেই সংবাদ পাইলেন—ইংরেজরা কলিকাতা অধিকার করিতে বদ্ধপরিকর। ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে, ২৭শে ডিসেম্বর, অভিযান ফলতা হইতে অগ্রসর হইল।

২৯ তারিখে মাণিকচাঁদ-চালিত সৈন্যের সহিত ছোটখাট একটা যুদ্ধ হইল—মাণিকচাঁদ পাগড়ী উড়িতেই নিজেও উধাও হইলেন। **বজবজ-যুদ্ধে** নবাব-শক্তি পরাজিত হইল। ক্লাইব ও ওয়াটসন ২রা জানুয়ারী (১৭৫৭) কলিকাতায় প্রবেশ করিলেন—৩রা জানুয়ারী নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এক ইস্তেহার বাহির করিলেন।

বজবজ যুদ্ধের সংবাদ শুনিয়া নবাব **১৯শে জানুয়ারী** হুগলী পৌঁছিলেন। **৩রা ফেব্রুয়ারী** কলিকাতার বাহিরে আমির চাঁদের বাগান-বাটীতে শিবির স্থাপন করিলেন। **৫ই ফেব্রুয়ারী** ক্লাইব অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু খুব সুবিধা করিতে পারিলেন না। তবে নবাব ও তেমন আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা সন্ধি স্থাপিত হইল—খুবই উচ্চ মূল্য দিয়া সিরাজ সন্ধি ক্রয় করিলেন। ক্লাইব অনতিবিলম্বে—পথের কণ্টক ফরাসীদের উৎপাটিত করিতে উদ্যত হইলেন। ২৩শে মার্চ্চ চন্দননগর আত্মসমর্পণ করিল।

পলাশী-যুদ্ধের বাকী মাত্র ৩ মাস

(৭) **ঘরে শত্রু বাহিরে শত্রু**—সিরাজ অনেকটা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়; চোখের উপর শত্রুপক্ষ ইংরেজ মিত্রপক্ষ ফরাসীদের নিঃশেষ করিতে উদ্যত অথচ বাধা দেওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও শক্তি বা সাহস ছিল না। ইংরেজদিগের প্রতি তাহার বিরূপ মনোভাবকে তিনি চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই, এদিকে কিন্তু ইংরেজের ফরাসীদমনে বাধাও দেন নাই। তাঁহার অস্থির চিত্ততা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, দাক্ষিণাত্যে বুসির কাছে পত্র লিখিয়াও বসিয়াছিলেন।

এদিকে গৃহশত্রুদের স্বরূপও তাহার নখদর্পণে ছিল; কিন্তু শত্রুদের গায়ে হাত দেওয়ার অবস্থা তখন ছিল না। হিন্দুজমিদারবর্গের অনেকেই তখন বাকী কর না দেওয়ার ফিকির খুঁজিতেছিলেন—সুতরাং সিরাজের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা আঁটিবার প্রবৃত্তি তাহাদের স্বাভাবিক। রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ সকলেই কোন না কোন কারণে সিরাজ-দ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ফলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

মীরজাফর ছিলেন এত সবের গোড়া—তাহাও অবিদিত ছিল না। সিরাজ মহা ধন্দে পড়িয়াছিলেন—তাঁহার ঘরে শত্রু বাহিরে শত্রু।

এপ্রিলের শেষাশেষি 'কলিকাতা কাউন্সিল্‌এ' মীরজাফর প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের পত্রাদি আসিতে লাগিল। ১লা মে মীরজাফরের সহিত কোম্পানী চুক্তি করা স্থির করিলেন। কাশিমবাজার কুঠিয়াল উইলিয়াম ওয়াটস্‌কে মুর্শিদাবাদে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিবার ভার দেওয়া হইল। ওয়াট্‌স গোপনে গোপনে মীরজাফর প্রমুখ প্রধানগণের সহিত দেখা করিতে লাগিলেন। ১১ই জুন মীরজাফরের স্বাক্ষরিত চুক্তি—কলিকাতায় প্রেরিত হইল এবং ১২ই জুন ওয়াটস্‌ নিজে মুর্শিদাবাদ হইতে চম্পট দিলেন। ১৩ই জুন ক্লাইব ৩০০০ সৈন্যসহ (৮০০ মাত্র ইউরোপীয়) মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ওয়াটস্‌ সাহেবের কাশিমবাজার ত্যাগের সংবাদ পাইয়া সিরাজ বুঝিলেন—সম্মুখ যুদ্ধ আসন্ন ও অনিবার্য্য। "নবাব এইবার প্রমাদ গণিলেন। ঐদিনেই মীরজাফরের প্রাসাদ আক্রমণের অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু এক্ষণে আর মীরজাফরকে প্রসন্ন না করিতে পারিলে গত্যন্তর নাই, এই চিন্তা করিয়া [illegible] সন্দেহ ত্যাগ করিলেন। পুনর্মিলনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। মীরজাফর তাঁহাদের কথায় সম্মত হইবার ভাব দেখাইলেন...আত্মাভিমান পরিহার করিয়া, [সিরাজ] সামান্য একজন অনুচর সঙ্গে মীরজাফরের বাটিতে উপনীত হইলেন। পুনরায় পুনর্মিলনের কথা পড়িল, "যথারীতি কোরাণ লইয়া উভয়পক্ষে শপথও হইল।" এইভাবে নিরুপায় সিরাজ নিজের পৃষ্ঠদেশ কুচক্রী মীরজাফরের কাছে অনাবৃত করিয়া দিয়া, পলাশী প্রান্তরে ইংরেজ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। শত্রুকে বিশ্বাস করার ফল হাতে হাতেই ফলিল। মীরজাফরের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ বাহিনী পরাজিত হইল। সিরাজ পলাইয়াও পরিত্রাণ পাইলেন না—মহম্মদী বেগের খড়্গাঘাতে বাংলার স্বাধীন নবাবের উষ্ণশির ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। 'ক্লাইবের গর্দ্দভ'

মীরজাফর মাত্র ১৩ দফা চুক্তি করিয়া বাঙ্গলাকে ইংরেজ বণিকের হাতে তুলিয়া দিল।

ঐতিহাসিক নাটক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা

ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাসমাত্র নহে—ঐতিহাসিক-ঘটনাসংশ্লিষ্ট নরনারীর জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের স্মরণীয় ঘটনার রস-রূপ—এ কথা সত্য, কিন্তু একথাও সত্য যে ঐতিহাসিক নাটকে জীবন-রসের চাহিদা যেমন থাকে তেমনি থাকে ঐতিহাসিক ভাবশুদ্ধির চাহিদা ; আদর্শ ঐতিহাসিক নাটক আমরা তাহাকেই বলিতে পারি যেখানে জীবনরস ও ঐতিহাসিক ভাবশুদ্ধি বা বাস্তবতা অবিরোধে অবস্থান করে। সুতরাং ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রশ্ন উঠিয়াই পারে না। তবে 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা' একহিসাবে যেমন ধরা-বাঁধা, অন্য হিসাবে তেমনি আপেক্ষিক—এ কথাও মনে রাখা দরকার। ঘটনা জাগতিক কিন্তু ঘটনার ব্যাখ্যা—তাৎপর্য্যের ধারণা—মানসিক এবং মানসিক বলিয়াই অনেকটা ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কারের সাপেক্ষ। ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিলেই এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাইবে। একজাতির কাছে যিনি দেবদূত অন্যজাতির কাছে তিনি শয়তান—এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে যথেষ্টই আছে। সুতরাং '**ঐতিহাসিক বাস্তবতা**' কথাটি প্রয়োগ করিবার সময়, গোঁড়ামি না প্রকাশ পায় সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার—মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবতা আপেক্ষিক বলিয়া, সামাজিক সংস্কার-সাপেক্ষ বলিয়া, 'মোটামুটি' শব্দটি দ্বারা উহাকে বিশেষিত করিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যথা সম্যগ্‌দৃষ্টির স্থলে মিথ্যাদৃষ্টির প্রাধান্য ঘটিবার আশঙ্কাই বেশী।

নাটকের ঐতিহাসিকত্ব

গিরিশচন্দ্রের **সিরাজদ্দৌলা নাটকের** ঐতিহাসিকত্ব বিচার করিবার মুখে এই **কথাটি বেশী** করিয়াই মনে রাখা আবশ্যক ; কারণ সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই সিরাজদ্দৌলার "ঐতিহাসিক বাস্তবতা"র বাহিরের অর্থাৎ ঘটনা-গত রূপের

দিকটি সম্পর্কে ঐক্য থাকিলেও অন্তরের অর্থাৎ তাৎপর্য্যের দিকটি বিসংবাদিত।

আপেক্ষিক ঐতিহাসিকত্ব

এক দৃষ্টিকোণে সিরাজ অপদার্থ, লম্পট, অত্যাচারী, শয়তান, অন্য দৃষ্টিকোণে সিরাজ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, স্বাধীনতা রক্ষায় ঐকান্তিক, দুর্ভাগ্যের হতভাগ্য বলি, ষড়যন্ত্রের দুষ্টচক্রে নিষ্পেষিত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতার প্রতিনিধি। সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহা পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইংরেজ-অধীন ভারতবাসী সিরাজদ্দৌলাকে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ হইতেই বেশী দেখিয়াছে—নব-জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে সিরাজ শুধু বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নহে, সিরাজ ফিরিঙ্গি-শক্তির—তথা ব্রিটিশ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম সম্মুখ সংগ্রামের প্রতীক। প্রগতিশীল চিন্তার কাছে সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক বাস্তবতার আত্মিক রূপটি এখানেই। হেগেলের পরিভাষায় বলা যাইতে পারে—এই ধারণাটাই সিরাজদ্দৌলার "Idea"। এই "আইডিয়া"টিকে সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক বাস্তবতার আত্মা বলা চলে। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা এই 'আইডিয়া'র ক্ষেত্রেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষে ও বাংলার স্বাধীনতা—দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্কল্পে ও আকাঙ্ক্ষায় সিরাজের মেরুদণ্ড গঠিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা বিদেশী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখা সিরাজ নহে। নাটকের ভূমিকাতে নাট্যকার তাহার দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করিয়াছেন—"বিদেশী ইতিহাসে সিরাজচরিত্র বিকৃতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী।" এই রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল

সিরাজের স্বরূপচিত্রে সিরাজের প্রধান বাস্তবতার মূল কেন্দ্রটি রহিয়াছে।

তারপর—অর্থ-রাজনৈতিক সংস্থা-গত বাস্তবতার প্রশ্ন। সিরাজদ্দৌলায় ঐতিহাসিক পটভূমি পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে—দেশটি প্রকৃতপক্ষে জমিদার জায়গীরদারগণের অধিকারেই ছিল, দেশের আর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থা ও ধনসম্পদ জমিদারবর্গের বিশেষতঃ জগৎশেঠ প্রমুখ বণিকগণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল—জগৎশেঠই নবাবের অর্থভাণ্ডার ছিলেন, এক কথায় দেশের ধনবল ও জনবলের উপর ঐ সকল জমিদার-জায়গীরদার-বণিকশ্রেণীরই প্রভাব ছিল। ইঁহারা নিজ নিজ স্বার্থচিন্তা ছাড়া আর কোন কিছুই করিতেন না। রাজকর ফাঁকি দিয়া, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করিবার দিকেই ইঁহাদের বেশী ঝোঁক ছিল। এই কারণে নবাবের প্রতি মৌখিক আনুগত্য দেখাইলেও অর্থস্বার্থে আঘাত লাগিতেই গোপনে নবাবের শত্রুশিবিরে যোগ দিয়া ইঁহারা নবাবকে পদচ্যুত করিবার ফন্দি আঁটিতেন। অর্থের হিসাব নিকাশ করিতে বলায় ইঁহাদের অনেকের সহিত সিরাজদ্দৌলার সংঘর্ষ হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ অনেকটা আর্থনৈতিক কারণেই সিরাজের বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূলে অর্থ স্বার্থের চিন্তাই বেশী কাজ করিয়াছিল। নাট্যকার খুব তলাইয়া না দেখিলেও আর্থনৈতিক ঘটনার পরোক্ষ ও সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক ঘটনারাজি প্রায় সমস্তই উপস্থাপিত করিয়াছেন। পূর্ণিয়ার সওকৎজঙ্গের ও ইংরেজবণিক-শক্তির সাহায্যে সিরাজকে তাড়াইয়া বাধায় এবং পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে 'ঘসেটি রাজবল্লভ জগৎশেঠ মীরজাফরের' সহযোগী কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ—ইংরেজ বণিকদের ন্যায় নীতি উপেক্ষা করিয়া ছল বল কৌশল প্রয়োগ, বিশ্বাসঘাতক ও শত্রু বলিয়া জানা সত্ত্বেও সিরাজদ্দৌলার বার বার স্বার্থান্ধ শত্রুদের কাছে অযথা আত্মসমর্পণ—এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় পুরোপুরিই নাটকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। নাটকের অন্তর্বর্তী ঘটনার হিসাব লইলেই উক্তিটির সমর্থন পাওয়া যাইবে।

বাহ্য ঐতিহাসিকত্ব

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের প্রথম **প্রত্যক্ষ ঘটনা**—ষড়যন্ত্রের প্রধান ঘাঁটি মতিঝিল আক্রমণ এবং ঘসেটি বেগমকে মতিঝিল হইতে অপসারণ দ্বিতীয় **প্রত্যক্ষ ঘটনা**—বিশ্বস্ত দাসীর (জহরা) সাহায্যে ধনরত্ন স্থানান্তরিত করা এবং তৃতীয় **প্রত্যক্ষ ঘটনা**—রায়দুর্লভ মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মোহনলাল-মীরমদনকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা। পরোক্ষ ঘটনা—(ক) রাজবল্লভাদির সহিত ঘসেটির ষড়যন্ত্র (খ) নবাবী অর্থ লইয়া কৃষ্ণদাসের কলিকাতায় ইংরেজের শরণাপন্ন হওয়া (গ) ঘসেটির প্রধান মন্ত্রণাদাতা মীর নজর আলীর সসৈন্যে পলায়ন (ঘ) ঘসেটির পালিতপুত্র একরামদ্দৌলার মৃত্যু (ঙ) একরামদ্দৌলার শিশুপুত্র মোরাদদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইবার চক্রান্ত (চ) নজর আলির সহিত ঘসেটির অবৈধ সম্পর্ক (ছ) রাজবল্লভের সহিত অন্তরঙ্গতা, (জ) ঘসেটির চক্রান্তে হোসেনকুলি বধ। (ঝ) কৃষ্ণদাসকে হিসাব-নিকাশের জন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিতে ইংরেজদের প্রতি নবাবের আদেশ, ইংরেজ কর্তৃক নবাবের আদেশ উপেক্ষা। (ঞ) সওকৎজঙ্গের নিকট পূর্ণিয়ায় মীরজাফর কর্তৃক দূতরূপে মীরণ প্রেরিত। (ট) মোহনলাল মন্ত্রীপদে এবং মীরমদন সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত। ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত বিস্তারিত করিবার অধিকার নাট্যকারের আছে এ কথা স্বীকার করিলে দেখা যাইবে—প্রথম গর্ভাঙ্কের প্রত্যক্ষ ঘটনার প্রথমটি মুখ্য এবং ঐতিহাসিক। দ্বিতীয়টি—মুতাক্ষরীণকার কথিত "বিশ্বস্ত দাসীর সাহায্যে অনেক স্বর্ণমুদ্রা স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সময় চক্রান্তকারিগণের সহিত যোগ দিয়া ইহার ব্যবহার করা হয়"—এই তথ্যের বিস্তার। তৃতীয় প্রত্যক্ষ ঘটনা—সত্য ঘটনারই সংক্ষেপ। পরোক্ষ ঘটনাগুলি পুরোপুরি ঐতিহাসিক। **দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের**—ঘটনা—অন্তঃপুরে আলিবর্দী বেগমের সিরাজকে উপদেশ দান—মীরজাফর প্রভৃতিকে রাজকার্যে স্থাপিত করিবার নির্দেশ—সিরাজের স্বীকৃতি—অনৈতিহাসিক নহে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—সওকৎজঙ্গের কাছে মীরজাফরের পত্র প্রেরণ—পত্র যোগে

বাংলা আক্রমণের জন্য আয়োজন—এবং "the same ignorant pride, insane ambition, uncontrollable passion, loseness of tongue and addiction to drink"—সওকৎজঙ্গের চরিত্র।

পরোক্ষ ঘটনা—(ক) ঘসেটি ও আমিনার সঙ্গে হোসেন কুলির সম্পর্ক—(খ) হোসেন কুলি-বধের কারণ ও প্ররোচনা (গ) মীরজাফরের স্ত্রী—সম্পর্কে আলিবর্দীর বোন (ঘ) সিরাজের দাম্পট্য—"নৌকোয় বেড়িয়ে দু'ধারই জাল জাল মেয়ে মানুষ দেখেছে—আর বেগম করেছে (ঘসিটের দাস আত্মবিবরণী দ্রষ্টব্য) (ঙ) সিরাজের সসৈন্যে রাজমহলে আগমন ২২শে মে ১৭৫৬। (চ) পীর-ফকিরগণের সাহায্যে (মানসা) সিরাজের সৈন্য আটকাইবার চেষ্টা [গোলামহোসেন বলেন—শওকৎজঙ্গ তখনও স্বীয় সভাসদগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, একজ সিরাজের মত পরিবর্ত্তন হইয়া যাহাতে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন এই ভাবে জপতপ করিবার প্রার্থনায় পীর ফকিরগণের আশ্রয় লইলেন—বাঙ্গলার ইতিহাস পাদটীকা-২০০পৃষ্ঠা] (ছ) সিরাজের প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ-'কলিকাতায় ইংরেজের সহিত কোন ও বিবাদ হ'বে থাকবে' (জ) শওকতের জন্য বাদশাহী সনদ আনয়নের জন্য তোড়জোড়—জগৎশেঠের সাহায্যে 'ফরমান-আনয়নের আয়োজন—সব ঘটনাই ইতিহাস সমর্থিত। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—প্রত্যক্ষ ঘটনা—কাশিমবাজারের কুঠি আক্রমণের পরে বন্দী কুঠিয়াল ওয়াটসেরও চেম্বার্সের মুক্তির জন্য ওয়াটস-পত্নীর আছড় পাড়িয়া লুৎফউন্নিসার কাছে কাঁদাকাটি, লুৎফার অনুনয়ে ওয়াটসের মুক্তি (২) সিরাজের পারিবারিক জীবন—(৩) সিরাজের সংযত জীবন যাপনের চেষ্টা ও উদারতা *পরোক্ষ ঘটনা (১) ড্রেকের কাছে নবাবের আদেশ—পেরিং পয়েন্ট (a redoubt and a draw-bridge called Perring's Redoubt across the ditch at Baghbazar) ভাঙ্গিতে হইবে—রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইতে হইবে—ড্রেকের নবাবী আদেশ উপেক্ষা (২) 'মাতামহী নিত্য নবাবার সংলগ্ন জানালা-প্রকোষ্ঠ হতে নবাবার কার্য্য দেখেন' (৩) রাণী ভবানীর কন্যা তারার প্রতি সিরাজের আসক্তির ইতিহাস। পরোক্ষ ঘটনাগুলি ইতিহাস-সমর্থিত

তবে প্রত্যক্ষ ঘটনার—প্রথমটি অকরুণ ; আলীবর্দী-বেগমের কৃপায় হলওয়েলের মুক্তি হয়—এই তথ্যের সম্প্রসারণ বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক—প্রত্যক্ষ ও প্রধান ঘটনা—(ক) কলিকাতা-আক্রমণের জন্য সিরাজের সঙ্কল্প—জগৎশেঠ-মীরজাফর প্রভৃতির পরামর্শ—সাবধানে বিরত করার চেষ্টা—*(খ) রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের চরিত্র। পরোক্ষ ঘটনা—কৃষ্ণদাসের পত্রে—কৃষ্ণদাস ও উঁমিচাদের কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন ঘটনাই অনৈতিহাসিক নহে। তবে প্রজাবৎসল, বাংলা-প্রাণ এবং ফিরিঙ্গি-বেষী সিরাজ বেশীএকটু আদর্শায়িত।

ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম গর্ভাঙ্কে—কলিকাতার ব্যাপার উপস্থাপিত এবং মোটামুটি ইতিহাসেই অনুসৃত। **দশম গর্ভাঙ্কে** ফোর্ট উইলিয়মে সিরাজের দরবার—প্রত্যক্ষ ঘটনা—হলওয়েলের বন্দীদশা (খ) কৃষ্ণদাস উমিচাদকে সিরাজের মার্জনা (উভয়ই ঐতিহাসিক), (গ) সিরাজের জাতিপ্রাণতা (আরোপিত), (ঘ) করিমচাচা ও তাঁহার টিপ্‌পনি ও সিরাজকে ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি [কল্পিত বটে তবে সিরাজ-চরিত্রের স্বরূপ প্রদর্শক]। **একাদশ গর্ভাঙ্কে**—সওকতজঙ্গের ও ষড়যন্ত্রকারীদের নানারূপ অতিরঞ্জিত মিথ্যা অপবাদ প্রচারের দৃশ্য—দানসা ফকিরের প্রচার। (যথার্থত অনৈতিহাসিক নহে)। **দ্বাদশ-গর্ভাঙ্কে** মুর্শিদাবাদে নবাব দরবার—মুখ্য উপস্থাপ্য হলওয়েলের মুক্তি তথা সিরাজের উদারতা, অন্ধকূপহত্যায় সিরাজের নির্দোষতা (অনৈতিহাসিক নহে) দানসা-ফকিরের নাসাকর্ণ-ছেদকরার আদেশ (ঐতিহাসিক)—রাসবিহারী কর্ত্তৃক সওকতজঙ্গের পত্র আনয়ন *(ঘ) ফরমান—আনয়ন ব্যাপার লইয়া জগৎশেঠকে চপেটাঘাত *(ঙ) প্রতিবাদে মীরজাফর প্রভৃতির অস্ত্রত্যাগ। * (চ) আলিবর্দী বেগমের সহসা প্রবেশ—তাঁহার অনুরোধে মীরজাফর প্রভৃতির অস্ত্রগ্রহণ এবং সিরাজের অনুতাপ প্রকাশ। এই গর্ভাঙ্কের "ঘ" সম্পর্কে সন্দেহ জাগিতে পারে বটে, কিন্তু দান্‌সা (দানাশা) বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক বলিয়াই গণ্য he was recognised by a Muslim faqir, named Dana shah, whose ears and nose

he had ordered to be cut off in the days of his power—History of Bengal—Vol II Ed—J. Sarkar আর জগৎশেঠের অপমান, মীরজাফরের প্রতিবাদে অস্ত্রগ্রহণে অস্বীকৃতি—ঐতিহাসিক (বাংলা ইতিহাস—বন্দ্যোপাধ্যায়—২২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অতএব দেখা যাইতেছে—প্রথম অঙ্ক উপস্থাপিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘটনার দুই একটি বাদে আর সবই ইতিহাস-সমর্থিত, জহরা ও করিমচাচা ঐতিহাসিক চরিত্র নহে—জহরা "বিশ্বস্তা দাসী"রই বিস্তার এবং করিমচাচার নামটি বোধ হয় "করম আলি"রই (মজঃফর নামা'র লেখক—করম আলি) অপভ্রংশ রূপ।

দ্বিতীয় অঙ্কের—প্রথম গর্ভাঙ্কে (জগৎশেঠের বাগান বাড়ীতে) প্রত্যক্ষ ঘটনা; জগৎশেঠ মীরজাফর প্রভৃতির গোপন পরামর্শ (খ) মীরমদন-আনীত ইংরেজদের—পত্র পাঠ এবং সিরাজদ্দৌলার মীরজাফর প্রভৃতির বিরুদ্ধে চাপা অভিযোগ (গ) মানিকচাঁদ-কর্তৃক ইংরেজের কলিকাতা পুনরধিকারের সংবাদ জ্ঞাপন (ঘ) মীরজাফরকে গদীতে বসাইবার পরামর্শ। পরোক্ষ ঘটনা—সিরাজের চরিত্রের পরিবর্তন—"বিলাসী নয়, সকলকে যথাযোগ্য ঠিক সম্মানে সম্মানিত করেছেন"। (২) মোহনলালের পূর্ণিয়ার অধিকার লাভ—গোলাম হোসেন খাঁকে বিতাড়ন (৩) ইংরেজেরা মীরজাফর খাঁ বাহাদুরের নিকট যে পত্র নবাব সরকারে পেশ করিবার জন্য দেন, মীরজাফর প্রভৃতির (মাণিক চাঁদের) সেই পত্র গোপন করা। মাণিকচাঁদের কারসাজিতে—কলিকাতা পুনরধিকার (৪) ইংরেজের হুগলী-আক্রমণের উদ্যোগ। এই গর্ভাঙ্কে উপস্থাপিত ঘটনা স্বরূপতঃ অনৈতিহাসিক নহে, তবে ঘটনাগুলি এক দৃশ্যে সমাহৃত করা হইয়াছে। **দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের** ঘটনা,—ঘসেটির ও জহরার সংযোগ। ঘসেটি বেগমের অর্থে ষড়যন্ত্র পুষ্ট হইয়াছিল—এই ঐতিহাসিক তথ্যেরই বিস্তার। **তৃতীয় গর্ভাঙ্কের** মুখ্য ঘটনা—ঘসেটির ছলনা দ্বারা লুৎফার নিকট হইতে সিরাজের নামাঙ্কিত মোহর সংগ্রহ (ঘসেটির ষড়যন্ত্রেরই অংশ) **পরোক্ষ ঘটনা**—স্বৈর-বিলাসিনী ফৈজীকে 'বায়ু প্রবেশের সকল দ্বার রুদ্ধ ক'রে হত্যা করার কাহিনী।

(ঐতিহাসিক)। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—"কলিকাতা—উমিচাঁদের উদ্যানস্থ কক্ষ"—(দৃশ্যটিও ঐতিহাসিক)—মুখ্য ঘটনা :—(ক) ইংরেজের সন্ধি-প্রস্তাব; সন্ধি সিরাজ পক্ষে হিতকর বলিয়া মীরজাফর প্রভৃতির সন্ধির বিরোধিতা তথা যুদ্ধে উসকানি (খ) সন্ধি প্রস্তাবে-সম্মত ওয়াটস ও ক্লাপটন্ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে দাওয়ানখানায় যাইতে প্রস্তুত হইলে—উমিচাঁদের মিথ্যা ভয় দেখাইয়া ভাগাইয়া দেওয়া তথা সন্ধি ভাঙিয়া দেওয়া। (ঐতিহাসিক ঘটনা—বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫১ পৃষ্ঠা)। পঞ্চম গর্ভাঙ্কের ঘটনা সাহেবদিগের (ক্লাপটন ও ওয়াটস্) পিছনে পিছনে জহরার ক্লাইবের ফোর্ট-উইলিয়াম মধ্যস্থ গৃহে উপস্থিতি ও সহযোগের প্রস্তাব। (রোমাঞ্চকর কল্পনা !)। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কের দৃশ্য—কলিকাতা গড়ের মাঠ, প্রধান ঘটনা—ইংরেজের অতর্কিত আক্রমণে 'সর্বনাশ' উপস্থিত, (খ) সিরাজের সন্ধি-প্রস্তাব—"যে স্বত্বে ইংরেজ সন্ধি করতে প্রস্তুত সেই স্বত্বে সন্ধি হোক।"— * (গ) সিরাজের নৈরাশ্য—বাঙালী-জাতির অন্তর্বিরোধের সমালোচনা। * (গ-এর শেষটুকু আরোপ)।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য নবাব দরবার (* সন্ধির পরের ঘটনা)—প্রধান ঘটনা—(ক) ওয়াটসের উপর সিরাজের তর্জন-গর্জন—ওয়াটসকে শূলদণ্ড দেওয়ার হুমকি (ঐতিহাসিক) ২৫১ পৃষ্ঠা বাঙ্গলার ইতিহাস বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) ইংরেজ-উকীলকে নবাব-দরবার পরিত্যাগ করার আদেশ (একটু পরের ঘটনা) (গ) মানিকচাঁদের প্রতি নবাবী দ্রব্য আত্মসাৎ করার অভিযোগ—প্রথমে কারাদণ্ড, পরে শিরচ্ছেদ-দণ্ড এবং মীরজাফর প্রভৃতির অনুনয়ে শেষপর্যন্ত ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা—(ঐতিহাসিক ঘটনা)। * (ঘ) মীরজাফর প্রমুখ অমাত্যদের সহিত ইংরেজের পক্ষ লইয়া পরামর্শ—(ঙ) ঘসিটি বেগমকে (মুন্সীজা) মতিঝিল হইতে আনিয়া মুর্শিদাবাদে নিয়া থাকিবার জন্য সিরাজের অনুরোধ—মুন্সীজার সতর্কবাণী ও বিদায়গ্রহণ (১০ই এপ্রিল, ঐতিহাসিক) (চ) ওয়াটস ও উকীলকে পুনরাহ্বান—ফরাসী বিতাড়নের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দেওয়ার নির্দেশ (ছ) ষড়যন্ত্রকারী জগৎশেঠ—মীরজাফর প্রভৃতিকে সিরাজের ভর্ৎসনা—একে

একে দণ্ড দেওয়ার সঙ্কল্প—(ইতিহাস-সমর্থিত)। পরোক্ষ ঘটনা :—(১) বিনানুমতিতে ইংরেজের চন্দননগর অধিকার (২) ফরাসী 'মঁসিয়েল' ও অন্যান্য ফরাসীদের নবাবের আশ্রয় গ্রহণ (৩) আহম্মদ শাহ আবদালির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সিরাজের পাটনা যাত্রার কথা—আবদালির প্রত্যাবর্ত্তনে পাটনাযাত্রা স্থগিত (৪) সিরাজের পত্রের উত্তরে ক্লাইবের উক্তি 'যারা ইংরাজের শত্রু তারা নবাবের শত্রু হওয়া উচিত' (৫) ইংরেজ চন্দননগর আক্রমণ করিলে উমিচাঁদ ও নন্দকুমারের আচরণ। (৬) ফরাসী'দের পলায়নে ইংরেজের রসদ যোগান।—(ইতিহাস সমর্থিত) দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—দৃশ্য 'জগৎশেঠের বৈঠকখানা' (জগৎশেঠের গৃহে ষড়যন্ত্রের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল : বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রধান ঘটনা :—(ক) 'দৌহিত্র-পুত্রের আবাহন'—রটনা করিয়া ষড়যন্ত্রকারিগণের সম্মেলন) The Seths took the leading part in organising this plot for purifying the administration ..History o: Bugal. Sarkar. (খ) ইংরেজের সন্ধিপত্র লইয়া আলোচনা (গ) করিমচাচা-কর্ত্তৃক সিরাজের হোসেন-কুলি বধ ও স্ত্রৈণহত্যা সমর্থন (ঘ) 'মীরমদন-মোহনলালের প্রবেশ ও ষড়যন্ত্রকারীদের মনোভাব-পরিবর্ত্তনের শেষ চেষ্টা ('ঘ'—কল্পিত।) তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—ঘসেটি ও জহরার নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ (অতিরঞ্জিত) চতুর্থ গর্ভাঙ্কে প্রত্যক্ষ ঘটনা—(ক) উমিচাঁদকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য লিখিত একখানি জালসন্ধিপত্র এবং একখানি আসল সন্ধিপত্র লইয়া আমিরবেগের ওয়াটস-সমীপে আগমন (খ) জালসন্ধিপত্রে ৩০ লক্ষ টাকা ও জহরতের একচতুর্থাংশ প্রাপ্য দেখিয়া উমিচাঁদের উল্লাস (গ) জহরার বুদ্ধিনির্দ্দেশে বেগমবেশে ওয়াটসের মীরজাফরের সঙ্গে দেখা করার ফন্দি। (জহরা-অংশ কাল্পনিক)। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে —প্রত্যক্ষ ঘটনা—(ক) মীরজাফরের অন্তঃপুরে—রমণীবেশে ওয়াটস (খ) সন্ধিপত্রে মীরজাফরের স্বাক্ষর • (গ) সিরাজদ্দৌলা ও আলিবর্দ্দী বেগমের মীরজাফরের গৃহে আগমন (ঘ) কোরাণ স্পর্শ করিয়া মীরজাফরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ। (ইতিহাস-সমর্থিত ঘটনা)।

চতুর্থ অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্কের দৃশ্য 'পলাশী—ইংরাজ শিবিরের পার্শ্ব' প্রধান ঘটনা—(ক) নবাব-সৈন্যের সংখ্যা দেখিয়া ক্লাইবের নৈরাশ্য ও আতঙ্ক—আমির-বেগকে ডাকিয়া কিকিং উমিচাঁদকেই (বন্দ্যোপাধ্যায়) জিজ্ঞাসা * (খ) জহরার কথায় ক্লাইবের খানিকটা স্বস্তি (খ—কাল্পনিক।) দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য 'পলাশী—নবাব শিবির'—প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা (ক) যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা—(খ) মীরমদনের মৃত্যু (গ) সিরাজের যুদ্ধক্ষেত্রে গমনোদ্যোগ (আরোপ) (ঘ) মীরজাফরের পদতলে রাজমুকুট রাখিয়া নবাবের মর্যাদা, মুসলমানের মর্যাদা, বাঙ্গলার মর্যাদা, বাঙ্গলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সিরাজের কাতর অনুরোধ (ঙ) মীরজাফরের সিরাজদ্দৌলার নিরুপায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ। (চ) জহরার কথায় সিরাজ-দ্দৌলার প্রাণবধ-আতঙ্কে মুর্শিদাবাদে প্রস্থান। * পরোক্ষ ঘটনা—(১) বৃষ্টিতে বারুদ ভিজিয়া যাওয়া (২) ইংরাজ সৈন্যের পশ্চাদপসরণ ও আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ (৩) রায়দুর্লভ-ইয়ারলতিফের সেনা দর্শকের ন্যায় যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান (৪) মীরজাফরের কপট আচরণ—উপদেশ ছলে নবাবকে দিয়া মোহনলালকে আক্রমণ হইতে নিবৃত্ত করা। প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে—'ঘ'—ঐতিহাসিক (বন্দ্যোপাধ্যায়—২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তবে বাঙ্গলার মর্যাদা...ইত্যাদি আরোপ এবং "চ" প্রথম অংশ কল্পিত, শেষাংশ ঐতিহাসিক ঘটনা। পরোক্ষ ঘটনা সবগুলিই ঐতিহাসিক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—প্রত্যক্ষ ঘটনা—(ক) মোহনলাল ও সিনফ্রের আক্রমণে ইংরেজের কাহিল অবস্থা (খ) জহরার মিথ্যা সংবাদে মোহনলালের যুদ্ধ ত্যাগ—সৈন্যদিগের পলায়ন। (গ) ক্লাইবের আক্রমণ। প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে 'খ'-এর প্রথম অংশ অর্থাৎ জহরার মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার অংশ—কাল্পনিক, মোহনলালের ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ সত্য ঘটনা।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কের প্রত্যক্ষ ঘটনা—মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত সিরাজের নৈরাশ্য, আতঙ্ক ও পলায়ন, [ঐতিহাসিক] (খ) করিম চাচার সহিত সিরাজের পরিচ্ছদ-বিনিময় [আরোপিত] (গ) ঘসেটি-আমিনা-বেগম, ঘসেটি মোহনলাল মুখোমুখি—(আরোপিত) মীরণের সিরাজের অন্বেষণ ও পশ্চাদ্ধাবন—(ঐতিহ্য-সমর্থিত)

(চ) মীরণ কর্তৃক ঘসেটির লাঞ্ছনা (আরোপিত)। পরোক্ষ ঘটনা— (১) রাজকোষাগার লুণ্ঠ করিয়া সিরাজ ও সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ (২) জয়োন্মত্ত শত্রু-সৈন্যের মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসরণ (৩) ঘসেটি বেগমের অর্থে জনসাধারণের সিরাজপক্ষ বর্জন (৪) সকলের হৃদয়ে ধারণা—ইংরেজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ বাতুলতা। (সবগুলিই ইতিহাস সমর্থিত) পঞ্চম গর্ভাঙ্ক—করিমচাচার সিরাজের পলায়ন সহজ করিবার জন্য নবাবীবেশে পরিভ্রমণ (কল্পনা) ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক—দৃশ্য—ভগবানগোলা পীরের দরগা (প্রত্যক্ষ ঘটনা):—দানসা ফকিরের দরগায় জহরার উপস্থিতি (কাল্পনিক) (খ) দানসার দরগায় সিরাজের আশ্রয় গ্রহণ (ঐতিহাসিক) (গ) দানসার জুতা দেখিয়া সিরাজকে চিনিয়া ফেলা ও মীরকাসিম প্রভৃতিকে সংবাদ দেওয়া (ঐ) (ঘ) মীরকাসিমের হস্তে সিরাজ বন্দী—লুৎফ অপমানিত (ঐতিহাসিক) পরোক্ষ ঘটনা— ১ পাটনার রাজা রামনারায়ণের সিরাজ সকাশে দূত প্রেরণ (২) মুর্শিদাবাদ সিরাজ সাহায্যে তৎপরতা (ঐতিহাসিক, বন্দ্যোপাধ্যায়—৩০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পঞ্চম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক—সিরাজকে বধ করিবার জন্য আলিবর্দী-প্রতিপালিত মহম্মদীবেগ নিযুক্ত—ইতিহাস-সমর্থিত। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—মীরণের লুৎফউন্নিসার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা—ওয়াটস-পত্নীর আবির্ভাব, হস্তক্ষেপ—সিরাজের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ওয়াটস পত্নীর চেষ্টা (কল্পনা) তৃতীয় গর্ভাঙ্কের প্রত্যক্ষ ঘটনা— (ক) কারাগারে আবদ্ধ অনুতাপ-দগ্ধিত সিরাজ (খ) মহম্মদীবেগের তরবারি আঘাতে সিরাজের মৃত্যু (গ) ওয়াটস-পত্নীর লুৎফউন্নিসার উপস্থিতি—লুৎফার প্রতি ওয়াটস-পত্নীর সমবেদনা (ঘ) জহরার আবির্ভাব। [(গ) ও (ঘ)—কল্পিত]—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক—প্রত্যক্ষ ঘটনা:—সিরাজের গোরস্থানে করিম চাচা ও মোহনলালের সাক্ষাৎকার (খ) সিরাজের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মোহনলালের অস্ত্র ত্যাগ ও আত্মসমর্পণ (মোহনলাল ভগবানগোলায় ধরা পড়েন—মুর্শিদাবাদে নহে সুতরাং ঘটনা-সংক্ষেপ হইয়াছে) (গ) প্রতিহিংসা পূর্ণ করিবার পরে—বিশ্বাসঘাতকদিগকে ধিক্কার দিতে দিতে—পতিপরায়ণা জহরার "পতন"।

(কল্পনা) **পঞ্চম গর্ভাঙ্কে**—সুসজ্জিত রাজপথে ক্লাইভ ও কুট অর্থাৎ ইংরেজের বিজয় অধিকার দেখান—সঙ্গে অর্থলোভী উমিচাঁদের হীনতা দেখান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে—প্রত্যক্ষ ঘটনা—(ক) চুক্তি পত্রের দাবী দাওয়া মিটাইবার জন্য ক্লাইবের—নির্দেশ (ঐতিহাসিক) (খ) উমিচাঁদের প্রতিফল (ঐতিহাসিক) (গ) টাকার জন্য মীরজাফরের উপর ক্লাইবের চাপ (ঐতি) (ঘ) মোহনলালের মৃত্যুসমাবেশ (ঙ) মীরজাফরের আফশোস।

সপ্তম গর্ভাঙ্কে—সিরাজের সমাধিতে লুৎফউন্নিসার দীপদান (ঐতিহাসিক) ওয়াটস পত্নীর মালাদান (কল্পিত।)

উল্লিখিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘটনার হিসাব-নিকাশ করিলে দেখা যাইবে—সিরাজদ্দৌলা-সম্পর্কিত তথ্য সমূহকে নাট্যকার অধিক সংখ্যায় স্থান করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঘটনার সংক্ষেপ বিস্তার করিবার অধিকার নাট্যকারের আছে এ কথা মনে রাখিয়া বলা যায়—নাট্যকার সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসের দেহ এবং আত্মা উভয়কেই প্রায় যথাযথভাবে রূপ দিয়াছেন; * তবে করিম চাচা ও জহরা অতিরঞ্জিত তথা অনুচিত আচরণে ঐতিহাসিক ভাবশুদ্ধিকে বা ভাবগম্ভীর পরিবেশকে যে বেশ হালকা করিয়া তুলিয়াছে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। করিমচাচাকে যদিও কোন ভাবে সাংকেতিক করা যায়, জহরা একেবারেই 'আকাশস্থ নিরালম্ব' হইয়া পড়িয়াছে। হোসেন কুলি খাঁর স্ত্রীর প্রতিহিংসাপরায়ণতা স্বাভাবিক—কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণতার দেশ-কাল অবস্থা—ঔচিত্যকে সে যে-ভাবে লঙ্ঘন করিয়াছে তাহা খুবই অস্বাভাবিক—অন্ততঃ ঐতিহাসিক নাটকের বাস্তবতার পক্ষে ক্ষতিকর।—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রেরণা—রচনা—অভিনয়

প্রেরণাকে আমরা মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নাম দিতে পারি—১। **বাহ্য প্রেরণা** ২। **আভ্যন্তরিক প্রেরণা**। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি দিয়া বক্তব্যকে স্পষ্ট করা যাইতে পারে—১৫ই বৈশাখ ১৩৩৩ সালে প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয়ের কাছে একখানি

চিঠি লিখিতে যাইয়া লিখিতেছেন—*"একটা নাটক আমার সমস্ত মন এবং অবকাশ অধিকার করে বসেছে। আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে চুকিয়ে দিতে হবে এই হচ্ছে ফরমাস। **তাগিদে পড়ে লিখতে সুরু করেছিলাম কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্তরিক তাগিদ তার বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে! তার ফল হয়েছে এখন সময়মতো নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে......*। এখানে বাহ্য তাগিদ ২৫শে বৈশাখের মধ্যে শেষ করে......" এবং আভ্যন্তরিক তাগিদ......নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে অনির্বচনীয় রস-রূপে ব্যক্ত করা। এইরূপে রচনার বাহ্য তাগিদ—পরিবেশ, যশোলাভ অর্থলাভ, লোকশিক্ষা (সত্য) মঙ্গল-বিধান (শিব)—প্রভৃতির দিক হইতে আসিতে পারে, কিন্তু রচনার আভ্যন্তরিক তাগিদকে সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি—শৈল্পিক (aesthetic)। এই তাগিদের ফলে নির্বাচিত বস্তু শিল্পীর মন অধিকার করিয়া বসে......খাওয়া নাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। অবস্থাটি···চেকভের "সি গাল" নাটকের "ট্রিগোরিন" চরিত্রের (লেখক) কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে........"I am haunted day and night by one persistent thought : I ought to be writing, I ought to be writing.........when I finish work I race off to the theatre or to fishing, if only I could rest in that and forget myself But no, there is a new subject rolling about in my head like a heavy iron cannon ball and I am drawn to my writing table and make haste again to go on writing and writing" (দ্বিতীয় অঙ্ক)—"এই পর্য্যায়ে শিল্পী রস-রূপের ধ্যানেই নিমগ্ন—বিষয়বস্তু হইতে চূড়ান্ত রূপ-রস আদায় করিতে নিযুক্ত (*রস-রূপেরই অন্য নাম সৌন্দর্য্য)—এক কথায় সুন্দরের ধ্যানে সমাহিত। কার্লমার্কসের ভাষানুকরণে বলা যায়—according to the laws of beauty—রূপ-রস সৃষ্টি করিতেই শিল্পী তখন ঐকান্তিক। অবশ্য তাহা বলিয়া একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে

যে—সৌন্দর্যের কোন নৈর্ব্যক্তিক ও পারমার্থিক সত্তা আছে। সংক্ষেপে বলা যায় সৌন্দর্য্য, শক্তির রূপে ও রসেই নিহিত এবং সেই রূপ ও রস জীবন সত্য সাপেক্ষ তথা জীবনের সত্য ও শিবের সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সম্পর্কিত।

বলা বাহুল্য, সিরাজদ্দৌলা নাটকের প্রেরণা—বাহ্য প্রেরণা—তদানীন্তন যুগ-পরিবেশের ও রঙ্গমঞ্চের চাহিদা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙালী দেশ নব-জাতীয়তাবোধের দীক্ষা গ্রহণ করে। বাংলা শুধু হিন্দুর নহে বাংলা শুধু মুসলমানের নহে বাঙলা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই মাতৃভূমি—হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় বাঙালী-জাতির উপাদানবিশেষ—এই নব জাতীয়চেতনা লইয়া জাগ্রত জাতি স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতিগঠনের বা 'জাতি-চেতনার প্রথম সুস্পষ্ট ঘোষণা পাওয়া যায়—একদিকে প্রতাপের মুখে, অন্যদিকে ঈশা খাঁর মুখে। প্রতাপ ঘোষণা করেন—* "হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহরসসিক্ত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃকার্য্যে, প্রতিযোগিতায়, বার্দ্ধক্যে আত্মীয়তায়—এস ভাই সব—আমরা এক প্রাণে এক মনে মায়ের দুঃখ দূর করি। পরস্পরের সহায়তায় বঙ্গে মহাযশোরের প্রতিষ্ঠা করি। মাতৃসেবাকার্য্যে আমরা ব্রাহ্মণ নই, সেখ নই, পাঠান নই—বঙ্গসন্তান (৩য় অঙ্ক—৩য় দৃশ্য) ঈশা খাঁর মুখে শোনা যায়—"দুদিন বাদে সবাই বুঝবে বাংলা মুলুক হিন্দুরও নয় মুসলমানেরও নয় বাঙ্গালীর।"

লর্ড কার্জন তাঁহার দম্ভ, দুর্ব্যবহার ও কুচক্রান্ত দ্বারা এই জাতীয়-চেতনার উদ্দীপনায় খুবই সাহায্য করেন। ভেদনীতি ছাড়া ভারতের বুকে চাপিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব—লর্ড ডাফরিন তাহা অনেক আগেই উপলব্ধি করেন এবং আলি-গড়ের স্যর সৈয়দ আহম্মদকে ভেদ-নীতি প্রয়োগের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন—প্রচার করিতে থাকেন হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতি। কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ প্রমুখ মুসলমানগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও—দূরদর্শী ও দেশপ্রেমিক

মুসলমানগণ, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের মূল সভাপতি মহম্মদ রহিমতুল্লা সায়ানি প্রভৃতির মত কংগ্রেসের আদর্শই অনুসরণ করেন—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারতের স্বাধীনতাই দাবী করেন—ধর্মনিরপেক্ষ জাতি-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। জাতীয়তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার এই উত্থান আঁচ সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন (১৮৯৮) শুধু যে বাতাস দিয়া জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তাহা নহে, প্রকাশ্য ভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন (১৮৯৯) এবং একের-পর-এক দুর্ব্যবহারে ভারতীয় অভিমানকে আঘাত করিতে থাকেন। তিনি লক্ষ্য করেন শিক্ষিত বাঙালীরাই রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রষ্টা এবং 'মস্তিষ্ক' সুতরাং বাঙলাকে জব্দ করিতে পারিলেই উৎপাতের জড় দূর হইবে। ১৯০৩ সালের ওরা ডিসেম্বর সরকারী তরফ হইতে ঘোষিত হয়—বাঙলাদেশকে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য দুই ভাগে ভাগ করা হইবে। "রাজনীতি-সচেতন বাঙালী ইহার মধ্যে নবোদ্ভূত জাতীয় চেতনা খণ্ডিত করিবার প্রয়াস লক্ষ্য করে এবং বুঝিতে পারে যে, বাঙলার সমাজদেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহাকে ভেদ-বিভেদের পঙ্কিল ও সংকীর্ণ দিক হইতে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার সংগোপন চেষ্টা ইহাতে নিহিত, কাজেই রাজরোষগ্রস্ত হইলেও বাঙালী ক্ষোভে ও অপমানে গর্জিয়া উঠে, তাঁহার মন্ত্র জপ হয়—ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।—("ভারতের মুক্তি সংগ্রাম") কার্জনেরও জেদ চাপিয়া যায়—বঙ্গভঙ্গ করিতেই হইবে তিনি সমগ্র উত্তর বঙ্গ, ফরিদপুর ও বরিশাল জিলা নবগঠিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই ঘোষণা বাহির হইতেই সমগ্র বাঙলা তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত নড়িয়া উঠে। ইংরেজের বিরুদ্ধে রুদ্ধ আক্রোশে জাতি গুমরিয়া উঠে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণ-বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায়। দেশাত্মবোধ হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য, নব-জাতীয়তা বোধ, ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ ও স্বদেশী আন্দোলন—জাতির মুখ্য প্রচার্য বিষয়ে পরিণত হয়।

"সিরাজদ্দৌলার" আত্মা এই নবজাতীয়তাবাদ। এই দেশাত্মবোধ, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা দিয়াই সিরাজদ্দৌলার দেহ-

মন্ত্র-মন্ত্র গঠিত। নবজাতীয়তাবাদীর চোখে—পলাশী-যুদ্ধেই পরাধীনতার ইতিহাসের আরম্ভ—সিরাজদ্দৌলাই বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব—স্বাধীন বাঙলার তথা বাঙালী জাতির রাষ্ট্রপ্রতিনিধি, ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রামী নায়ক। তাই ইংরাজের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সময়ে সিরাজদ্দৌলাকেই যে প্রথমেই মনে পড়িবে—সহজেই অনুমান করা চলে। বাস্তবিক, ইহার আগে সীতারাম প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতির মাধ্যমে, জাতীয়তাবাদকে তথা স্বাধীনতা-আন্দোলনকে এতদিন পরোক্ষভাবেই পোষণ ও প্রচার করা হইয়াছে। ইঁহাদের কাহারও পক্ষে ইংরাজ-বিদ্বেষী [redacted] ইংরাজ-বিরোধী হওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া ইঁহাদের মাধ্যমে আর যাহাই করা যাউক, প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ-বিদ্বেষ ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা প্রচার করা সম্ভব হয় নাই। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্য মিটাইতে পারেন না—তাহা পারেন—সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম প্রভৃতি ইংরেজ বিদ্বেষী নবাবরাই। গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলাকে মাধ্যম নির্বাচন করিয়া—একাধারে নবজাতীয়তাবাদ, হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য, ফিরিঙ্গি বিদ্বেষ দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-কামনাকে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন।

সাহিত্যে এই ধরণের ইংরেজ-বিরোধিতা এত উগ্রভাবে আগে বা পরে খুব কমই ব্যক্ত হইয়াছে। অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তিটি খুবই সত্য—"বাঙালী যাহা দেখিতে চাহিয়াছিল দ্রষ্টা গিরিশচন্দ্র যেন তাহার আভাস বুঝিয়াই তৎক্ষণে সিরাজদ্দৌলা লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিলেন"—("বাঙ্গালায় ত্রিশ বৎসর")

রচনা ও অভিনয় :—

সিরাজদ্দৌলা-নাটক রচিত ও অভিনীত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। 'বলিদান'-নাটকের (৮ই এপ্রিল) প্রথম অভিনয় এবং সিরাজদ্দৌলা-নাটকের প্রথম অভিনয়ের (৯ই সেপ্টেম্বর) মধ্যে চার মাসের ব্যবধান বটে, কিন্তু মিনার্ভা-মঞ্চে বলিদানের পরেই সিরাজদ্দৌলার আবির্ভাব নহে—মাঝখানে ২৯ শে জুলাই

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণাপ্রতাপ কয়েক রজনীর জন্য দর্শকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ জুলাই-আগষ্ট মাসেই সিরাজদ্দৌলা রচিত হয়—অপরেশবাবুর ভাষায়—"মিনার্ভার রঙ্গমঞ্চে রাণাপ্রতাপ নিতান্ত নিস্তেজ অবস্থায় মরিল দেখিয়া তিনি মুর্শিদাবাদের ভগ্ন কবর হইতে বাঙ্গলার নবাব সিরাজকে খুঁড়িয়া বাহির করিলেন।—"এই সময়ে তাঁহার বসিবার ঘরটি দেখিলে মনে হইত সেটি যেন একটা ছোটখাট লাইব্রেরী……স্তূপীকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে ধ্যান-নিবিষ্টের ন্যায় গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে মগ্ন।" প্রমাণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না—বাহ্য প্রমাণ রহিয়াছে—সিরাজদ্দৌলা নাটকের ভূমিকায় আর আভ্যন্তরিক প্রমাণ নাটকের তথ্য-রাজির ঐতিহাসিকত্বে।

প্রথম অভিনয়—'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে—১৩১২ সালের ২৪শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৫)। প্রথম পাণ্ডুলিপির বহু স্থান অদলবদল করিয়া পুলিশের হাত হইতে পাশ করান হয়। (নাট্যকার 'করিমচাচা'র এবং পুত্র দানীবাবু—'সিরাজদ্দৌলা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।)

শ্রেণী-পরিচয়

*[The term 'history play' is difficult of precise theoretic limitation and in practice the differentiation of the strict members of this new type from those plays on historical subjects which follow the more conservative rules of comedy and tragedy is a task opproaching impossibilities—(Tudor Drama—C. F. Tucker Brooks).]

বিচার যেমন বিধান-সাপেক্ষ, শ্রেণী-পরিচয়ও তেমনি 'শ্রেণী-বিভাগ'—সাপেক্ষ। বলা বাহুল্য শ্রেণী-বিভাগ যেখানে নাই সেখানে শ্রেণী-পরিচয়েরও কোন প্রশ্ন উঠে না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে শ্রেণী-বিভাগের অস্তিত্ব অনাবশ্যক হইতে পারে, ক্রোচের মত বলা যাইতে পারে—প্রত্যেক সৃষ্টিই বিশেষ সৃষ্টি—বিশেষ গুণ-ধর্মে, স্বতন্ত্র সৃষ্টি, সুতরাং যেখানে সামান্য ধর্ম নাই সেখানে জাতি-বিভাগ অসম্ভব—কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জাতি-বিভাগ অপরিহার্য বলিয়াই সাদৃশ্য-সামান্যের ভিত্তিতে, যুগযুগ ধরিয়া জাতি-বিভাগ, প্রজাতি-বিভাগ চলিয়া আসিতেছে এবং যতদিন মানুষের সংজ্ঞা (concept) গঠনের সামর্থ্য থাকিবে ততদিন চলিবেও। বাস্তবিক যেমন লৌকিক জগৎকে তেমনি শিল্পের অলৌকিক জগৎকেও মানুষ জাতি-প্রজাতি-শ্রেণী প্রভৃতির গণ্ডী দিয়া মনের মধ্যে সাজাইয়া গুছাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে। শিল্পকে সে ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্র, সংগীত ও সাহিত্য—এই পাঁচ জাতিতে ভাগ করিয়া লইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্রত্যেক জাতিকে আবার কয়েকটি প্রজাতিতে (species) ভাগ করিয়াছে। এই বিভাগের ফলে—সাহিত্য-শিল্পে কাব্য, মহাকাব্য, কথাসাহিত্য নাট্য প্রভৃতি প্রজাতি-বিভাগ আমরা দেখিতে পাই। এখানেই বিভাজন-বৃত্তি স্থগিত হয় নাই; প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে আবার নানা শ্রেণীর কল্পনা করা হইয়াছে—বিশেষ কোন গুণধর্মের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণী-বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। নাট্যের

শ্রেণী-পরিচয় বলিতে বুঝায়—পরিকল্পিত 'শ্রেণী'-বিভাগ অনুসারে বিশেষ নাট্য-রচনাকে কোন্ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহাই বিচার করিয়া দেখা।

এখানেই বলার দরকার, শ্রেণী-বিভাগের প্রথার উপরেই শেষপর্যন্ত শ্রেণী-পরিচয় নির্ভর করে এবং তাহা করে বলিয়াই প্রথার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-পরিচয়ের প্রচেষ্টাতেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে।

নাট্যের শ্রেণী-বিভাগের ইতিহাস সবিস্তারে আলোচনা করিবার অবকাশ এখানে নাই। এখানে, যত ভিত্তিতে নাট্যে শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে, সংক্ষেপে, তাহাদের একত্র করিয়া একটা তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। (গ্রন্থকারের "নাট্য-তত্ত্বমীমাংসা"-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।)

১। **সংবেদনা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে :—**

(ক) ট্র্যাজেডি (খ) ট্র্যাজি-কমেডি (গ) কমেডি (ঘ) ফার্স (মেলোড্রামা ?)

২। **বিষয়বস্তুর উৎস—ভিত্তিতে :—**

(ক) পৌরাণিক (খ) ঐতিহাসিক (গ) ঐতিহাসিককল্প চরিতমূলক (ঘ) সামাজিক (পারিবারিক) (ঙ) উপকথাশ্রয়ী (চ) কাল্পনিক

৩। **বিষয়বস্তুর ভাব-বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিতে :—**

(ক) ধর্মমূলক (খ) নীতিমূলক (গ) আধ্যাত্মিক (ঘ) রাজনৈতিক (ঙ) আর্থনৈতিক (চ) প্রেম-মূলক (ছ) দেশ-প্রেমমূলক (জ) সমাজ-সমস্যা-মূলক (ঝ) ষড়যন্ত্রমূলক (ঞ) রোমাঞ্চকর দুঃসাহস-মূলক (ট) অপরাধ-আবিষ্কারমূলক প্রভৃতি।

৪। **উপাদান-যোজনা-ভিত্তিতে :—**

(ক) গীতি-নাট্য, (খ) যাত্রা (অপেরা) (গ) নৃত্যনাট্য (ঘ) নাটক (ড্রামা)।

৫। **আয়তন বা অঙ্ক-সংখ্যা ভিত্তিতে :—**

(ক) মহানাটক (মহানাটককল্প) (খ) নাটক (গ) নাটিকা (ঘ) একাঙ্কিকা।

৬। **গঠন-রীতি-ভিত্তিতে :—**

(ক) ক্লাসিকাল-বন্ধ (খ) রোমান্টিক-বন্ধ (॰ (গ) দৃশ্য-পরম্পরা)

৭। **‘রচনা-বন্ধ-ভিত্তিতে’ :—**

(ক) পদ্যনাটক (খ) গদ্যনাটক (গ) গদ্যপদ্যময় (চম্পূ ?)

৮। **“উপস্থাপনা-রীতি”-ভিত্তিতে :—**

(ক) (ক) বাস্তবিক (realistic) (খ) ভাবতান্ত্রিক (Idealistic) (গ) রূপক (allegorical) (ঘ) সাংকেতিক (symbolic)— (ঙ এক্সপ্রেশানিস্টিক)……

৯। **‘উদ্দেশ্য’-ভিত্তিতে :—**

(ক) ঘটনা-মুখ্য—drama of incidents) [মেলোড্রামা]

(খ) রস-মুখ্য—(drama of passion)

(গ) চরিত্র-মুখ্য—drama of character)

(ঘ) তত্ত্বমুখ্য—(drama of Idea)

(ঙ) মিশ্র—(Mixed)

নাটকের শ্রেণী-পরিচয়—অবশ্য পরিপাটি শ্রেণী-পরিচয়—দিতে হইলে, নাটকখানি উল্লিখিত শ্রেণীসমূহের কোন্ কোনটির অন্তর্ভুক্ত তাহা দেখাইতে হইবে। তবে ‘প্রাধান্যেন ব্যপদেশ’ সূত্র প্রয়োগ করিয়া প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াই সাধারণতঃ ‘শ্রেণী-পরিচয়’ দেওয়া হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে যে প্রশ্নে বিসংবাদ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা সেই সেই প্রশ্নের মীমাংসাই মুখ্য লক্ষ্য হইয়া থাকে। যেমন এ ক্ষেত্রে—সিরাজদ্দৌলা ট্র্যাজেডি কি না, অর্থাৎ সিরাজদ্দৌলা ট্র্যাজেডির স্তরে পৌঁছিয়াছে কি মেলোড্রামার স্তরে পড়িয়া আছে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলেই শ্রেণী-পরিচয়ের বড় প্রশ্নটির মীমাংসা করা হইবে। এই কারণেই প্রথম দিকে অন্যান্য প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত মীমাংসা করিয়া শেষ দিকে মুখ্য প্রশ্নটির সবিস্তারে আলোচনা করা যাইতেছে।

*প্রথমতঃ—‘বিষয়বস্তু’-ভিত্তিতে—সিরাজদ্দৌলা একখানি ঐতিহাসিক নাটক। ইহাতে, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়—ইংরেজ বণিক লক্ষ্মীর সুতক্ষ পথের অন্ধকারে রাজসিংহাসন আনিবার তথা ভারতে

ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস—বাঙলার ও বাঙালীর স্বাধীনতা বিকাইয়া দেওয়ার কলঙ্কময় ইতিহাস উপস্থাপিত হইয়াছে। নামে ইহা ব্যক্তি-চরিত্রধর্মী বটে, কিন্তু কার্যতঃ এই নাটকে ব্যক্তির মধ্য দিয়া জাতির এক মহা যুগ-সন্ধির ইতিহাস সবিস্তারে নাট্যায়িত হইয়াছে। এক হিসাবে ইহা ব্যক্তি জীবনের অন্য হিসাবে ইহা বাঙলার তথা ভারতের এক যুগ সন্ধির রূপ—ব্যক্তি ও জাতি এখানে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া আছে।

'বিষয়বস্তুর উৎস'-ভিত্তিতে

*দ্বিতীয়তঃ—'বিষয়বস্তুর ভাব-প্রকৃতি'—ভিত্তিতে—সিরাজদ্দৌলা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক ও স্বদেশ-প্রেম মূলক নাটক। স্বদেশপ্রাণ সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ঘরে বাহিরে ষড়যন্ত্র এবং সেই ষড়যন্ত্রের ফলে পলাশী প্রান্তরের যুদ্ধে বাঙলার ও বাঙালীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সূর্যের অস্তগমন—এই নাটকের কাহিনীর ভাববস্তু (theme)

*তৃতীয়তঃ—'উপাদান যোজনা'—ভিত্তিতে—সিরাজদ্দৌলা "নাটক"। তবে গীত-যোজনা সর্বক্ষেত্রে নাটকোচিত হয় নাই; বলা যায় গীতযোজনায় যাত্রাপ্রবণতা আসিয়া গিয়াছে।

চতুর্থতঃ—আয়তনের দিক দিয়া সিরাজদ্দৌলা নাটকের মাত্রা লঙ্ঘন করিয়া অনেকটা মহানাটকের আকার গ্রহণ করিয়াছে। হিসাবে পঞ্চাঙ্ক হইলেও, গর্ভাঙ্কের সংখ্যাধিক্যে)—মহানাটক-সুলভ ব্যাপ্তি দেখা দিয়াছে। প্রথম অঙ্কে ১২টি গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কে—৬টি, তৃতীয় অঙ্কে—৫টি, চতুর্থ অঙ্কে—৬টি, এবং পঞ্চম অঙ্কে—৭টি,—মোট ৩৬টি গর্ভাঙ্কে, ২০২-পৃষ্ঠার এক বৃহৎ কলেবর পরিগ্রহ করিয়াছে। নাট্যকার ভূমিকায় জানাইয়াও দিয়াছেন—"সিরাজচরিত্র লইয়া দুই খণ্ড নাটক লিখিলে, প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইতে পারিত।...... সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের উৎসাহে নাটকখানি একখণ্ডে সমাপ্ত করিয়াছি, 'সেই জন্য নাটকের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইয়াছে"

বাস্তবিক, ৩৬ দৃশ্য অভিনয় করিতে হইলে এবং প্রতি দৃশ্যের জন্য গড়ে ১০ মিঃ ধরিলে—৬ ঘণ্টার কমে অভিনয় শেষ করা সম্ভব নহে। কাটছাট না করিলে বা দৃশ্য বাদ না দিলে যে অভিনয় করানো যায় না—এ কথাটা নাট্যকার নিজেই উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন—প্রমাণ নাটকের ১৫ পৃষ্ঠায় পাদটীকা—*অভিনয়ের সময় সংক্ষেপার্থে ষষ্ঠ ও অষ্টম গর্ভাঙ্কের পরিবর্ত্তে * [ ] * অংশটি সন্নিবেশিত হইল)। সুতরাং নাটকখানিকে ঠিক 'নাটক' আখ্যা দেওয়া যায় না। আর্থিক গুরুত্বের দিক বিবেচনা করিয়া 'মহানাটক' বলিতে আপত্তি করিলে—"মহা-নাটককল্প" বা বৃহৎ-নাটক' শ্রেণী কল্পনা করিয়া ইহার স্থান করিয়া দেওয়া উচিত।

*পঞ্চমতঃ—'গঠন-রীতির দিক দিয়া নাটকখানি—'রোমান্টিক-বন্ধ' ইহাতে—বহুর সমবায়ে একটি 'একক'কে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। "ঘটনা-ঐক্য" বলিতে এরিস্টটল ও ক্লাসিক্যাল পন্থীরা যাহা বুঝিয়াছেন সেইরূপ সরল ঘটনা-ঐক্য নাই বটে, কিন্তু এখানকার ঘটনাগুলি (ঘসেটি-ঘটিত, সওকৎজঙ্গ-ঘটিত ইংরেজ-ঘটিত মীরজাফর ঘটিত) সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র-চক্রের কেন্দ্রটির সহিত যুক্ত থাকায় ও কেন্দ্রটিকে ঘিরিয়া আবর্ত্তিত হওয়ায় বেশ সহজ একটি "জটিল ঘটনা-ঐক্য" গড়িয়া উঠিয়াছে। রোমান্টিক বন্ধের নাটকের মতই এখানে দৃশ্য-বিন্যাসের মধ্যে কার্য্যকারণ—যোগের নিবিড় সম্পর্কটি নাই—ঘটনাগুলি পর্য্যায়ক্রমে এবং কালানুক্রমিক ভাবে পরপর ঘটিয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে—গঠনটি "এপিসোডিক" বা সরল (এরিস্টটল-মতে সিম্পল্) * ষষ্ঠতঃ—রচনা-বন্ধের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া দেখিলে—নাটকখানি প্রধানতঃ গদ্য-নাটক হইলেও—গদ্য-পদ্য মিশ্র (চম্পূ)।

*সপ্তমতঃ—উপস্থাপনা-রীতির ভিত্তিতে,—সিরাজদ্দৌলা নাটকখানি যথার্থ 'বাস্তবিক' (Realistic) নহে,—অনেক পরিমাণে রোমান্টিক বা 'ভাবতান্ত্রিক' (idealistic)। ঘটনা-চরিত্র-সংলাপ প্রভৃতির যে পরিমাণ সার্বত্রিক ঔচিত্য তথা বাস্তবতা থাকিলে বাস্তবিকতার মায়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়ায় সেই পরিমাণ

বাস্তবতা এখানে নাই। নাটকখানিতে বাস্তবিক ও ভাবতান্ত্রিক রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া সংক্ষেপে ইহাকে **মিশ্র-রীতিক** বলা যাইতে পারে।

অষ্টমতঃ—উদ্দেশ্যের দিক দিয়া নাটকখানিকে—প্রধানতঃ ভাব-মুখ্য বলা যায়। যদিও রস বা রসাবেগের মাত্রাও ভাবের মাত্রার খুবই কাছাকাছি। বস্তুত, প্রত্যেক বড় সৃষ্টিতেই ভাব ও রস ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে, কারণ রসসাহিত্যে ভাব বা চরিত্র যাহাই উদ্দেশ্য হউক না কেন রস অপরিহার্য আর সেই রসসাহিত্যই শ্রেষ্ঠ যাহাতে ভাব ও রস প্রতিস্পর্ধার সহিত বিরাজ করে। যেখানে ভাব রূপকে অতিবর্তন করে বা রূপ ভাবকে চাপিয়া ধরে—পিষিয়া মারে সেখানেই বুঝিতে হইবে শিল্পীর ভাবুক ও রসিক সত্তার ভার-সাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবুক ও রসিকের পূর্ণ সমন্বয় সুদুর্লভ। এই নাটকে নাট্যকারের ভাবুক-সত্তা খুবই সজাগ এবং প্রকাশ-প্রবণ—রসিক-সত্তা অনেকক্ষেত্রেই ভাবুকের কাছে কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে। ভাবুকের "রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপটি" (নাটকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) বুঝাইবার প্রয়াস, রসিকের দেখাইবার প্রয়াসের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ঠিক "the bias should flow by itself from the situation and action, without particular indication— (মিস্ কৌট্স্কির কাছে লেখা এঙ্গেলসের পত্র, ১৮৮৫)—বলিতে যাহা বুঝায় সেই আদর্শ অবস্থাটি নাটকে পুরোপুরি নাই। এই নাটকে পাত্র-পাত্রীকে "the mere mouthpieces of the spirit of the times" (কার্ল-মার্কস ১৮৫৯) করার দিকেই ঝোঁক বেশী দেওয়া হইয়াছে এবং 'ভাবকে' (নব জাতীয়তা ও ফিরিঙ্গি-চক্রান্তের হাত হইতে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখ।) প্রচার করিবার উদ্দেশ্য বড় হইয়া উঠিয়াছে। মার্কসের পরিভাষায় বলা যায়—"শেক্সপীয়ারাইজেশন্" অপেক্ষা "সিলারাইজেশন" বেশী হইয়াছে।

নবমতঃ—রস-সংবেদনার দিক দিয়া শ্রেণী-পরিচয় দেওয়ার প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার আগে রস-সংবেদনার ভিত্তিতে শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে

দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। নাট্যের শ্রেণী-বিভাগের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—প্রতীচ্যে ট্র্যাজেডি—কমেডি বিভাগটি প্রাচীনতম এবং ঐ বিভাগটির ভিত্তি সংক্ষেপে বলা যায়—"feeling tone" সংবেদনা বৈশিষ্ট্য, বিশেষতঃ বেদনা-ভাববদ্ধ এবং আমোদ ভাববদ্ধ। ট্র্যাজেডির সৃষ্টি ও সংবেদনা যথাক্রমে বেদনা ভাববদ্ধ হইতে এবং বেদনা-ভাব বন্ধের কাছেই। আর কমেডির সংবেদনা বিপরীত ক্ষেত্রে—আমোদ-বন্ধে এরিষ্টটলের 'পোয়েটিকস'-এ একে বলা হইয়াছে—"imitation of serious action"····· incidents arousing pity and fear"......, অন্যকে বলা হইয়াছে "dramatising the ludicrous"। প্রথম পর্যায়ে— ট্র্যাজেডি ভয়ানক-মিশ্র বেদনাজনক ঘটনার উপস্থাপনা, প্রধানতঃ করুণরসাত্মক নাটক, এবং কমেডি হাস্যোদ্দীপক ঘটনার উপস্থাপনা অর্থাৎ হাস্যরসাত্মক নাটক। পরবর্তীকালে—কমেডির মধ্যে উপবিভাগ কল্পনা করিবার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং 'কমেডি'কে মুখ্যতঃ লো-কমেডি এবং হাই-কমেডি (সিরিয়াস কমেডি)—দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তারপর করুণ-মিশ্র কমেডি বা ট্র্যাজেডি-হইতে-হইতে কমেডি" জাতীয় নাটকের জন্যও "ট্র্যাজি-কমেডি" শ্রেণী কল্পনা করা হয়। যাহা হউক কমেডির বিস্তৃত আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং ট্র্যাজেডির বিশেষ আলোচনায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করা যাক।

ট্র্যাজেডি শব্দটি যেমন 'গ্রীক', ট্র্যাজেডির লক্ষণটিও তেমনি গ্রীক সমালোচক এরিষ্টটল—নির্দ্ধারিত। লক্ষণটি সাধারণভাবে আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। [ট্র্যাজেডি লক্ষণের বিশেষ আলোচনা নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য] এখানে বিশেষ বক্তব্য এই যে এরিষ্টটলের গ্রন্থেই আমরা ট্র্যাজেডির একটি জাতি-বিভাগ দেখিতে পাই—দেখি এরিষ্টটল ট্র্যাজেডিকে মোটামুটি চার (পাঁচও বলা যায়) শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—যেমন (১) কমপ্লেক্স ট্র্যাজেডি [যে ট্র্যাজেডির কাহিনীতে ঘটনা-বিপর্যাস্ ও আবিষ্কার থাকে—অর্থাৎ যাহাতে বিস্ময়ের মাত্রা বেশী থাকে]

(২) প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি (করুণ রস বা আবেগ (passion) সৃষ্টি যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। (৩) এথিক্যাল ট্র্যাজেডি—(নীতি বা আদর্শ প্রচার করা যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য) (৪) সিম্পিল্ ট্র্যাজেডি (কাহিনীর গঠন যেখানে ঘটনার সংস্পৃষ্ট বিন্যাস মাত্র)—

(৫) স্পেক্‌টাকুলার……ট্র্যাজেডি ? ….(যেখানে spectacular element-এর (দৃশ্য) দ্বারা রস সৃষ্টির চেষ্টার প্রাধান্য)।* [বিশেষ লক্ষণীয়—অনেক পরিবর্তী কালে এসারক্রম্বি (?) নিকল মহাশয়, ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য করুণ রস (pity) সৃষ্টি নহে—উদ্দেশ্য "awe and grandeur"—বিস্ময় ভাব (অদ্ভুত রস) সৃষ্টি—বলিয়া যে নূতন মত স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বীজ এরিষ্টটলের—'কম্‌প্লেকস ট্র্যাজেডি'র মধ্যেই আছে] সকলেই জানেন—এরিষ্টটল উল্লিখিত পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে—প্রথমকে অর্থাৎ 'কম্‌প্লেকস ট্র্যাজেডি'কেই প্রথম শ্রেণীর মর্য্যাদা দিয়াছেন—এবং স্পেক্‌টাকুলার-শ্রেণীটিকে অধম ট্র্যাজেডি বলিয়া প্রায় অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করিবেন—ট্র্যাজেডির শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে এরিষ্টটলের যে প্রবণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই সহজ পরিণতি দেখা যায় পরবর্তী কালের—'হাই ট্র্যাজেডি' ও 'মেলোড্রামা' শ্রেণীর পরিকল্পনার মধ্যে। এরিষ্টটলের প্রথম শ্রেণীর কম্‌প্লেকস ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে—ট্র্যাজেডির স্থান এবং স্পেক্‌টাকুলার ও প্যাথেটিক ক্ষেত্রে মেলোড্রামার আবির্ভাব। এরিষ্টটল যেখানে সামান্য ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এক হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত সকলকেই ট্র্যাজেডি বলিয়াছেন, পরবর্তী কালে সেখানে 'ট্র্যাজেডি' শব্দটিকে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করার প্রবণতা দেখা দিয়াছে।—এই প্রবণতার ফলেই "ট্র্যাজেডি" প্যাথেটিক ড্রামা "মেলোড্রামা" প্রভৃতি উপশ্রেণী-বিভাগ দেখা দিয়াছে। আমাদের সমস্যা—এই শ্রেণী বিভাগ ও উহাদের স্বরূপ বিচার লইয়াই।

ট্র্যাজেডির ও মেলোড্রামার স্বরূপ

এইবার ট্র্যাজেডির স্বরূপ এবং মেলোড্রামার লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা

কর্তা যাউক ; কারণ সিরাজদ্দৌলার শ্রেণী পরিচয়ের জন্য—ট্র্যাজেডির স্বরূপ উপলব্ধি এবং মেলোড্রামার লক্ষণ নিরূপণ বলা চলে একরূপ অপরিহার্য্যই। ট্র্যাজেডির লক্ষণ নাটকখানিতে কি পরিমাণ আছে, আর মেলোড্রামার লক্ষণও বা কতটুকু আছে, শেষ বিচারে নাটকখানিকে ট্র্যাজেডি বলা হইবে কি মেলোড্রামা বলা হইবে—এই সব প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে যেমন জানিয়া লওয়া আবশ্যক—উভয়ের স্বরূপ, তেমনি জানিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক মেলোড্রামার ও ট্র্যাজেডির সীমারেখাটি।

ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্দ্ধারণের চেষ্টায় আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচারের পথে অগ্রসর হইতে পারি—

(১) ট্র্যাজেডির নায়ক (Tragic hero)
ট্র্যাজেডি বোধ (Tragic impression)
ট্র্যাজেডির রস (Tragic emotion)
ট্র্যাজেডির পরিণতি (Tragic endig)

ট্র্যাজেডির নায়ক-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকার জিজ্ঞাসা সম্ভব (ক) নায়কের বংশমর্য্যাদা (খ) নায়কের নৈতিক মান (গ) নায়কের ক্রিয়াতৎপরতা বা উদ্যম (ঘ) নায়কের নিজ দায়িত্ব। প্রথম জিজ্ঞাসা—নায়কের বংশ মর্য্যাদা—সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায়—এ বিষয়ে বিসংবাদ আছে এবং তাহার জের আজও মেটে নাই। "illustrious"-এর অর্থাৎ রাজা রাজড়ার শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় না ঘটিলে—"fall of a great man" না হইলে ট্র্যাজেডি হইবে না—এইরূপ অভিমত বহু প্রাচীন কালে সকলের মধ্যে এবং বর্ত্তমান কালে দুই একজনের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ট্র্যাজেডির ইতিহাস দেখিলেই দেখা যাইবে—সমাজ বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তথা সামাজিক বাসনার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাজেডি নায়কের বংশ-গত যোগ্যতার মাপকাঠিতেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তির জীবনকথার মধ্যে ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই—ব্যক্তি-মর্য্যাদার প্রসার বৃদ্ধির

ট্র্যাজেডির নায়ক

সঙ্গে সঙ্গে 'সাধারণ ব্যক্তিও' ট্র্যাজেডি-নায়ক হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। 'ডোমেষ্টিক ট্র্যাজেডি' সামাজিক-ট্র্যাজেডি নায়কের বংশ মর্যাদার নৈকষ্য ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। বিখ্যাত নাট্য-তত্ত্ব-মীমাংসক অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মহাশয় কৌলীন্য-প্রথার মোহ কাটাইতে পারেন নাই বলিয় গার্হস্থ্য-ট্র্যাজেডি বা সামাজিক ট্র্যাজেডিকে ট্র্যাজেডি বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেও—(দি থিওরি অফ ড্রামা —ডমেষ্টিক ট্র্যাজেডি পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)—ট্র্যাজেডি-নায়কের গণতন্ত্রায়নকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। "ট্র্যাজিক ইম্প্রেশন" জাগাইতে পারিলে—যে কোন ব্যক্তি আজ ট্র্যাজেডি-নায়ক হইতে পারে—এমনকি নাট্যকার আর্থার উইলিয়াম পিনেরো মহাশয়ের—"সেকেণ্ড মিসেস ট্যাঙ্কেরি" নাটকের নায়িকার মত পতিতারও কোন বাধা নাই। একথা সত্য—পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির রসের আস্বাদে এবং সামাজিক ট্র্যাজেডির রসের আস্বাদে একটু তারতম্য থাকিবেই কিন্তু তাহা আছে বলিয়া, একে ট্র্যাজেডি অন্যকে অপট্র্যাজেডি বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

এইবার নৈতিকমানের প্রশ্ন বিচার করা যাউক। নৈতিকমান সম্পর্কে এরিষ্টটলের বিখ্যাত সূত্রটি—"not too good not too bad" সুবিদিত। কিন্তু কত পাপাচরণ করিলে নাটক 'অতি-মন্দ' হইবে, তাহার মাত্রা বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই—সম্ভব নহে বলিয়াই হয় নাই। আর একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে নায়কের নৈতিকমানের প্রশ্নটি শেষপর্য্যন্ত—নায়কের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণের প্রশ্নের সহিত যুক্ত হইয়া আছে। নায়কের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে না পারিলে—ট্র্যাজেডির প্রধান রস—করুণ (pity) সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। নায়কের নৈতিকমান ও গুণপনা সহানুভূতির সহজ উদ্দীপক বলিয়াই ট্র্যাজেডি নায়কে নৈতিকমান আবশ্যক। মনে রাখা দরকার—লক্ষ্য "ট্র্যাজিক-ইম্প্রেশন", নায়কের গুণপনা সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় মাত্র। রস নিষ্পত্তির ক্ষমতা থাকিলে সেকেণ্ড মিসেস ট্যাঙ্কেরির মত দুশ্চরিত্রা ও পতিতাবৃত্তা নায়িকাকে দিয়াও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করা চলে।

আর একটা কথাও মনেও রাখিতে হইবে—নৈতিক-মান নায়কের 'বাহ্য আচরণ' দিয়া বিচার করিতে বসিলে চলিবে না। এইরূপ বিচারে কত বিভ্রাট ঘটে—সুবিখ্যাত শেক্সপীয়ার-অধ্যাপক পারসিভাল্ সাহেব মহাশয়ের—'ম্যাকবেথ'-সম্পাদনা হইতেই বুঝা যাইতে পারে। ম্যাকবেথকে তিনি "ট্রাজিক হিরো"র মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত! তাঁহার মতে—ম্যাকবেথ খারাপ লোক out and out a bad man সুতরাং সহানুভূতির অযোগ্য। লক্ষণীয়"—সহানুভূতিই লক্ষ্য—নৈতিকমান উপলক্ষ্যমাত্র। নায়কের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি বজায় রাখাই নাট্যকারের সমস্যা। নায়ক যে-ভাবে এবং যত আচরণই করুক দর্শকের সহানুভূতির কক্ষ হইতে চ্যুত না হইলে, ট্রাজিক নায়ক হইবার পক্ষে এ দিক দিয়া কোন বাধা নাই।

তৃতীয়তঃ নায়কের ক্রিয়া-তৎপরতা (activity)। নাটকে 'ক্রিয়া' (action) বলিতে কি বুঝায় তাহা খুব সুনির্দ্দিষ্টভাবে নির্দ্ধারিত আছে—এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপই করা হইবে। এ ক্ষেত্রেও নানা মুনির নানা মত দেখা যায়, এবং আমাদের মত যাহারা শব্দপ্রয়োগনেয়বুদ্ধি তাঁহারা মুনিদের মত-বিরোধের মধ্যে পড়িয়া খুবই বিভ্রান্ত। মোটামুটিভাবে ক্রিয়াকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিয়া দেখিয়া থাকি—প্রথমটি কায়িক (physical), দ্বিতীয়টি—মানসিক (mental) তৃতীয়টি—আত্মিক (spiritual) * [spiritual ও mental লইয়া দ্বন্দ্ব করিবার স্থল ইহা নহে—ভুলিলে চলিবে না] অতএব কায়িক ক্রিয়া যেমন ক্রিয়া, তেমনি মানসিক ও আত্মিক ক্রিয়াও ক্রিয়া। আর প্রত্যেক বড় বড় নাটকে—তিন স্তরের ক্রিয়াই বর্ত্তমান থাকে—তবে মানসিক ও আত্মিক ক্রিয়ার মাত্রাই বেশী থাকে। কারণ ক্রিয়া যত উর্দ্ধতন স্তরে উন্নীত হয়, সৃষ্টির মহত্ত্বও তত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নায়কের ক্রিয়া তৎপরতা বিচারের পূর্বে—এই কথাটি আমাদের মনের সম্মুখে রাখিতেই হইবে।

অবশ্য—নায়কের ক্রিয়া-তৎপরতা (activity ও passivity) বিচারের সময় আমরা সাধারণতঃ নায়কের পরিস্থিতি-সংঘটনের ঘটনা-নিয়ন্ত্রণের এবং

পরিস্থিতির বাধা অতিক্রম করিয়া বিশেষ একটি লক্ষ্যে পৌঁছিবার দৈহিক চেষ্টার পরিমাণ হিসাব করিয়া থাকি। এই হিসাবেই—ম্যাকবেথ আগাগোড়া ক্রিয়াতৎপর, "কীঙ্ লীয়র"—ওথেলো প্রভৃতি "more acted upon than acting"—এক কথায় নিষ্ক্রিয়।

যাহা হউক আমাদের আলোচ্য—ক্রিয়া-তৎপরতার তাৎপর্য্য নহে। আলোচ্য—ক্রিয়া-তৎপরতার প্রচলিত অর্থ এবং সেই প্রচলিত অর্থে ট্র্যাজেডির নায়কে কি পরিমাণ ক্রিয়া-তৎপরতা অপরিহার্য্য সেই প্রশ্নটি। দেখা গেল—ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে আগাগোড়া স্থূল ক্রিয়া-তৎপরতা অপরিহার্য্য নহে। দেহের ক্রিয়া অর্থাৎ শারীরিক উদ্যম বন্ধ বা বাধাগ্রস্ত হইলেও—মানসিক-আত্মিক ক্রিয়ার মাহাত্ম্যে নায়ক "ট্র্যাজিক"-মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে। এই প্রসঙ্গেই একটা কথা স্মরণীয়—ব্রুনেতিয়ের "striving towards a goal" বলিয়া ক্রিয়ার (এ্যাকশান) যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাকে একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিলেই দেখা যাইবে—লক্ষ্যে পৌঁছিবার কায়িক চেষ্টাও যেমন চেষ্টা, তেমনি কোন-কিছুকে পাওয়ার তীব্র কামনাও লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টারই রূপ-বিশেষ। যেমন কায়িক চেষ্টার ব্যর্থতায় তেমনি কামনার নিষ্ফল পরিণতিতেও ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা বর্ত্তমান। সুতরাং ট্র্যাজিক-নায়ক প্রচলিত অর্থে ক্রিয়াশীলও নিষ্ক্রিয় দুইই হইতে পারে। এই প্রসঙ্গেই আসে—* নায়কের দায়িত্বের প্রশ্ন। এরিস্টটলের একটি মন্তব্য হইতেই এই সমস্যার উৎপত্তি। এরিস্টটল পোয়েটিক্স গ্রন্থে বলিয়াছেন—নায়কের শোচনীয় ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিবে—নীচতার জন্য নহে (not due to depravity), ঘটিবে—নায়কের কোন রূপ—বুদ্ধি-ভ্রংশের (error of judment) জন্য অথবা চরিত্রের কোন অন্তর্নিহিত আসক্তি বা দুর্বলতার জন্য (frailty)। তবে দেখান যাইতে পারে যে সব ক্ষেত্রেই বিশেষতঃ অনেক—প্যাথেটিক ট্র্যাজেডিতে, নায়ক-নায়িকার দুর্দ্দশা-দুর্ভোগ এবং ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মূলে উহাদের নিজেদের কোন দায়িত্ব নাই। জন্-এস-স্মার্ট মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত 'ট্র্যাজেডি-নায়ক প্রবন্ধে ('এসেস এ্যাণ্ড স্টাডিজ', দি ইংলিশ এসো-

লিয়েশন ৮ম খণ্ড)—'Trozan Women'-নাটকখানির দৃষ্টান্ত তুলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—নির্দোষ ব্যক্তিও (innocent person) ট্র্যাজেডির নায়ক হইতে পারে ; বুদ্ধিভ্রংশ বা চারিত্রিক দুর্বলতা সব ক্ষেত্রে থাকিবেই এমন কোন কথা নাই।

"ট্র্যাজেডির বা Tragic impression

এখানেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে—আসলে ট্র্যাজেডি-সংবিতের স্বরূপটি তবে কি ? নায়কের বংশ, নৈতিকমান প্রভৃতি যাহার উপায় এবং যাহা সকলের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সেই ট্র্যাজেডি-সংবিৎ—ইংরাজীতে যাহাকে বলে tragic impression' তাহা কি ? পৌরাণিক ঐতিহাসিক, সামাজিক নানা প্রকার ট্র্যাজেডির মধ্যে যাহাকে আমরা 'সামান্য' (Common) বলিয়া ধরিতে পারি—সেই 'ট্র্যাজেডি-সংবিৎ' (tragic impression)-কে এক কথায় প্রকাশ করিতে গেলে বলা যায়—• ব্যর্থ-অভিযোজন-জনিত আর্থিক দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের জন্ত বেদনা। আর একটু বিস্তৃতভাবে বলিলে বলা যায়—unmerited misfortune' বা sight of a loosing struggle"—বা "a will striving towards a goal"-এর ব্যর্থ প্রচেষ্টা ও বিপর্যয় দেখিয়া যে বেদনা বোধ জাগে তাহাই—'ট্র্যাজেডি-সংবিৎ'। প্রফেসর স্কাট মহাশয় বলেন—"There are tragedies, it has been said, of many types. What is common to all is the element of calamity and suffering ; and where these are present in literature tragedy may also be present. অবশ্য সঙ্গে সর্ত্তও আছে—(ক) দুর্বল ও নিরীহের প্রতিক্রিয়া-বিহীন দুঃখভোগ ট্র্যাজেডি নহে—ট্র্যাজেডিতে বিপত্তির বিরুদ্ধে দৈহিক বা অন্ততঃ মানসিক প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া থাকা চাই। (খ) বিস্ময়বোধ (sense of wonder) এবং রহস্যের আবেষ্টনী (sense of mystery which is something ultimate) থাকা চাই ; এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে পরিস্থিতির বা পরিবেষ্টনীর বিরুদ্ধে নায়ক-নায়িকার শারীরিক বা মানসিক প্রতিক্রিয়া (reaction) ট্র্যাজেডির

পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু—"Sense of something which is something ultimate"—অর্থাৎ পরাতত্ত্বের অবতারণা ও ব্যঞ্জনা, সবক্ষেত্রে থাকিবেই এ বলা যায় না। ঐতিহাসিক বা সামাজিক ট্র্যাজেডিতে পরাতত্ত্বের আবহাওয়া অপরিহার্য, তাহা বলা চলে না। ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তির মহান কোন আদর্শের জন্ত ঐকান্তিক অথচ নিরুপায় এবং নিষ্ফল সংগ্রামের তথা শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয় অবশ্যই ট্র্যাজেডি-সংবেদনা সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তেমনি সামাজিক কোন ব্যক্তির প্রতিকূল-শ্রেণী-বিন্যাসের বিরুদ্ধে ঐকান্তিক অথচ নিষ্ফল সংগ্রাম,—তথা শোচনীয় বিপর্যয় ট্র্যাজেডি-সংবিৎ সৃষ্টি করিতে পারে। গলসওয়ার্দির—"স্ট্রাইক"কে উদাহরণ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। মোট কথা—নাটককে ট্র্যাজেডি হইতে হইলে যে নাটকের চতুর্দিকে পারতত্ত্বীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। ইহলৌকিক অর্থাৎ সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়াও নায়ক 'ট্র্যাজিক' হইতে পারে। অবশ্য ট্র্যাজিক-সংবিতের গভীরতা বা সার্বজনীনতার মাত্রা প্রথম ক্ষেত্রে বেশী, অন্য ক্ষেত্রে কম হইতে পারে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে শিল্পের বিষবস্তু" সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ফলে, 'বিশেষ' রূপের মধ্য দিয়া যত সাধারণীকৃত বা সার্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে, ততই তাহার শৈল্পিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই দিক দিয়া দেখিলে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এইভাবের একটা স্তর-বিন্যাস লক্ষ্য করা যাইতে পারে—নিছক ঘটনা-সমাবেশ, নিছক বহির্দ্বন্দ্ব, বহির্দ্বন্দ্বের সঙ্গে নৈতিক তথা মানসিক দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ মানসিক দ্বন্দ্ব আত্মিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি স্তর। সৃষ্টি যত ঊর্ধ্ব স্তরে উঠিতে সক্ষম হয়, তত তাহাতে গভীরতা, তত তাহাতে সার্বজনীনতা ব্যক্ত হয়। 'ট্র্যাজিক ইম্প্রেশন' সৃষ্টি করিতে হইলে, নিছক বহির্দ্বন্দ্ব দ্বারা সম্ভব নহে—দ্বন্দ্বটিকে উন্নততর স্তরে—আদর্শের জন্ত সংগ্রামের বা আদর্শচ্যুত হওয়ার জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বের স্তরে অবশ্যই তুলিয়া লইতে হইবে—খাঁটি ট্র্যাজেডিতে…"the situation is moral, and the individual we may say, has to cope with a universe (understanding Drama) এ কথাটি মোটামুটিভাবে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

যাহা হউক, সংবিত্তের গভীরতা বা সার্বজনীনতার তারতম্যের প্রশ্ন বাদ দিয়া 'Tragic impression'-এর মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—ট্র্যাজেডি-সংবিৎ বিশেষ এক প্রকার **উপলব্ধি**, যাহার **বোধ অংশে** (Cognitive aspect) আছে—নায়কের নিরুপায় ও নিষ্ফল সংগ্রামের বা মহিমা অংশের ধারণা—দুঃখ-দুর্ভোগ ও ভাগ্যবিপর্যয়ের ঔচিত্য সম্পর্কে অন্তরের অন্তঃস্থলে একটা নিগূঢ় আপত্তি এবং **ভাব অংশে** (emotive aspect) আছে—নায়কের জন্য নিবিড় সহানুভূতি, বেদনা বোধ বা শোচনা। শোচনার সহিত যখন উল্লিখিত বোধের যোগ ঘটে তখনই "ট্র্যাজেডি সংবিৎ" সৃষ্টি হয়।—দুঃখের গভীরতার অনুপাতে এই সংবিত্তের তীব্রতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অর্থাৎ সংবিৎটি—বোধে ও ভাবে আরো উদ্রেক হইয়া উঠে।

এই প্রসঙ্গেই **ট্র্যাজেডি নাটকের রসের প্রশ্ন** উঠে। এই প্রশ্নের আলোচনায়, মূলসূত্র—এরিষ্টটলের মন্তব্য—"Incidents arousing **pity or fear**", ..."we must not demand of Tragedy any and every kind of pleasure, but only that which is proper to it. • And since the pleasure which the poet should afford is that which comes from **pity and fear** through imitation .. ...."

ট্র্যাজেডির রস

"শোক অথবা ভয়" এবং "শোক ও ভয়"—এই দুইটি উক্তির কোনটি সত্য সে মীমাংসায় প্রবেশ না করিয়া আমরা বলিতে পারি—এরিষ্টটলের মতে ট্র্যাজেডি—**'ভয়ানক'-মিশ্র করুণ-রসাত্মক নাটক**, এবং যে নাটক "thrill with horror and melt to pity"—করিতে পারে সেই নাটকই বড় ট্র্যাজেডি—সুতরাং ভাবের হিসাব করিতে গেলে বলা যায় **'বিস্ময়-ভয়মিশ্র' শোক** (pity) ট্র্যাজেডি নাটকের ভাব এবং **অদ্ভুত ও ভয়ানক-মিশ্র করুণ রস ট্র্যাজেডির রস।** উহাদের মধ্যে অদ্ভুত ও ভয়ানক 'প্রাসঙ্গিক' এবং করুণ আধিকারিক (প্রধান) রস। কোন ট্র্যাজেডিতে ভয়ানকের মাত্রা বেশী থাকে (*হরর

ট্র্যাজেডি) কোন ট্র্যাজেডিতে ভয়—তীব্রতাজনিত বিস্ময়ের মাত্রা বেশী থাকে, কোন ট্র্যাজেডিতে ("ট্র্যাজেডি অব্ সাফারিং" জাতীয় নাটকে) করুণের মাত্রা বেশী থাকে—এই যাহা পার্থক্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে—'প্যাথেটিক ট্র্যাজেডিকে এরিষ্টটল প্রথম স্থান দেন নাই ;—তাঁহার মতে, পাবপ্লেক্স ট্র্যাজেডি বা কম্‌প্লেক্স্ ট্র্যাজেডি প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডি। এই নির্দেশের এবং হেগেল প্রভৃতির আলোচনার উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মহাশয়—ট্র্যাজেডির রস সম্পর্কে নূতন এক সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার সিদ্ধান্ত—"Tragedy......has for its aim not the arousing of pity, but the Conjuring up of a feeling of awe allied to lofty grandeur."—আমাদের পরিভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়—ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য করুণ রস সৃষ্টি নহে—ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য—"অদ্ভুত রস" সৃষ্টি (বিস্ময়)। অধ্যাপক নিকল যে ট্র্যাজেডিকে একটু 'তুরীয় লোকে' তুলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—ডোমেষ্টিক ট্র্যাজেডির প্রতি বিতৃষ্ণার মধ্যেই তাহার প্রমাণ আছে। 'lofty grandeur'-এর মোহে তিনি ট্র্যাজেডি নায়কের বংশ-কৌলিন্যের জন্য ওকালতি করিতেও ছাড়েন নাই। সুতরাং অধ্যাপকের নিকলের সিদ্ধান্তটিকে একটু সতর্কভাবে গ্রহণ করিতে হইবে—কোন কোন ট্র্যাজেডির পক্ষে তাঁহার কথা সত্য বটে, কিন্তু সব ট্র্যাজেডিতেই 'awe and grandeur' খুঁজিতে গেলে ভুল করা হইবে। তারপর—"pity"কে বাদ দিয়া tragic impression' সম্ভব কি না তাহাও বিচার করিয়া দেখা দরকার। আমরা দেখিয়াছি—(পালিতাল সাহেব সম্পাদিত ম্যাকবেথ নাটকের ভূমিকায়), pity জাগ্রত করিতে না পারা পর্যন্ত কোন নায়ক "ট্র্যাজিক" হইয়া উঠে না—ট্র্যাজিক সংবিতের সহিত—শোক বা শোচনার অপরিহার্য্য যোগ রহিয়াছে।

ট্র্যাজেডির পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা এই যে, ট্র্যাজেডি "unhappy-ending"-এর নাটক ;—"বিয়োগান্ত নাটক" কথাটির মধ্যেই

ধারণাটি প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু ধারণাটির মধ্যে সত্যের মাত্রা বেশী থাকিলেও, উহা সম্পূর্ণ সত্যকে ব্যক্ত করে না।

ট্র্যাজেডির পরিণাম

যদিও এরিস্টটল ইউরিপিদিসের সমালোচকদিগের বিরূপ মন্তব্যের সমালোচনা করিবার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"It (=unhappy ending) is the right ending তথাপি সত্য এই যে প্রাচীন-গ্রীসে happy-ending"—ট্র্যাজেডির প্রচলিত পরিণাম ছিল এবং ফরাসীয় ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডির অনেকগুলিই—happy ending—অর্থাৎ মিলনান্ত পরিণাম। যাহা হউক এ সম্বন্ধে এই কথাটাই বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, ট্র্যাজেডি পূর্ণমাত্রায় বিয়োগান্ত যেমন হইতে পারে, আবার—আপাত—মিলনান্তও হইতে পারে অর্থাৎ পরিণাম আপাতদৃষ্টিতে মিলন-সূচক মনে হইলেও ট্র্যাজিক-সংবেদনার মাত্রা বেশী কম পড়ে না, বিষাদের রেশ যথেষ্ট পরিমাণেই থাকে। * (ট্র্যাজেডি-সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা—গ্রন্থকারের "নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা" গ্রন্থের [যন্ত্রস্থ] ট্র্যাজেডি অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

এইবার "ট্র্যাজেডি" ও "মেলোড্রামা"র পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। "মেলোড্রামা" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ :—মেলোস = গান, ড্রেম্ = নাট্য, অর্থাৎ গানযুক্ত নাট্য। ইতালীতে, গ্রীক নাটকের অনুরূপ গান-যুক্ত নাটক সৃষ্টির চেষ্টা হইতে ইহার প্রচলন—(Dafne 1599)। এক শতাব্দী পর্যন্ত অপেরা ও মেলোড্রামা সমার্থক থাকে। ক্রমে গান ও আকস্মিক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রধান 'সিরিয়াস ড্রামা' অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ করে। পরে অর্থসংকোচ ঘটিতে ঘটিতে—ট্র্যাজেডির—"a cruder and more popular Kin" (ডিক্সনারি অফ্ ওয়ার্ল্ড লিটারেচার) অর্থে দাঁড়াইয়াছে।

অধ্যাপক নিকলের ভাষায়—মেলোড্রামা ট্র্যাজেডির—"Plebeian relative"। অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মেলোড্রামা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাকে আমরা এইভাবে সাজাইয়া লিখিতে পারি :—

(১) মেলোড্রামায়—'song show and incideut prevailing characteristics

৫। ,,—"undue insistence upon incident"

৬। ,,—have nothing or practically nothing that makes an inward appeal......অর্থাৎ "stressing of the spiritual"

* (৪) তবে—(বিশেষ সূত্র) ......নাটকে মেলোড্রামা-সুলভ আকস্মিক বা রোম-হর্ষক ব্যাপার থাকিলেই যে নাটক 'মেলোড্রামা' হইবে তাহা নহে—চরিত্র-চিত্রণের ও ভাবব্যঞ্জনার গভীরতা (inwardness) তথা সার্বজনীনতা (universalness) ব্যক্ত হইলে, মেলোড্রামা সুলভ ঘটনাদি থাকা সত্ত্বেও নাটককে ট্র্যাজেডি বলিতে হইবে—(দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"হ্যামলেট"কে)

অধ্যাপক নিকলের সিদ্ধান্ত—It is then some inner quality—the stressing of the spiritual as opposed to merely physical that makes Tragedy out of melodrama and Comedy out of farce। অধ্যাপক নিকলের এই সিদ্ধান্তটি খুব মনোযোগ দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ "spiritual" ও "merely physical" কথা দুইটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ট্র্যাজেডিকে মেলোড্রামা এবং মেলোড্রামাকে ট্র্যাজেডি বলার বিপত্তি সর্বদাই থাকিবে। লক্ষণীয় নিকলের মতে—যে নাটক ঘটনা-কৌতূহল (merely physical) ছাড়া অন্য কোন গভীর ভাব বা রস ব্যক্ত হয় না তাহাই আসলে "মেলোড্রামা"। আর যখনই নাটকে গুরুতর কোন সংবেদনা সৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তখনই নাটক ট্র্যাজেডির স্তরে উন্নত হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গেই, "Understanding Drama"-গ্রন্থের পরিশিষ্টে ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার পার্থক্য নিরূপণ করিতে যাইয়া ব্রুক্স ও হিল্‌ম্যান যে নূতন ধরণের একটু মন্তব্য করিয়াছেন এবং খুব সম্ভব অধ্যাপক নিকলের মতেরই যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের অনেকের মধ্যেই এমন ধারণা আছে (বোধ হয় অধ্যাপক নিকলের—'শ্রেণী-বিভাগ পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়াই তাহা জন্মিয়াছে) যে, মেলোড্রামা ট্র্যাজেডিরই অপভ্রংশ বিশেষ

অর্থাৎ ট্র্যাজেডি রসোত্তীর্ণ হইতে পরিণত না হইলেই মেলোড্রামা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ব্রুক্স ও হিলম্যান বলেন—না, এই ধারণা সত্য নহে—ট্র্যাজেডি অথবা "প্রবলেম-প্লে" লেখার চেষ্টা বিফল হইলেও যেমন মেলোড্রামার সৃষ্টি হইতে পারে তেমনি 'মেলোড্রামা' লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও মেলোড্রামার জন্ম হইতে পারে। আর ট্র্যাজেডি রসোত্তীর্ণ না হইলেই যে মেলোড্রামা হইবে তাহাও বলা ঠিক নহে। ইঁহারা বলেন—"We shoud, however, guard against seeing melodrama merely as tragedy which does not come off tragedy may fail to come off and yet not be melo-drama Viz. Dr Jonnson's Irene ; or an author may aim only at melo-drama and what he does may be good or bad melo-drama অবশ্য ইঁহাদের মতেও—মেলোড্রামার পরিস্থিতিতে বাহ্যঘটনা-বৈকল্য অর্থাৎ পরিস্থিতি "Physical" এবং মেলোড্রামাতে—"good atheletic contest এর মত "excitement, tension suspense for their own sake···" থাকিলেও······ শেষ পর্যন্ত "it means nothing"; লক্ষণীয়—"অর্থ-গৌরব 'meaning' যে নাটকের আছে, যে নাটকে জীবনের রূপ তীব্র ভাব-সংবেদনার সহিত ব্যক্ত করা হয়, সে নাটকের ঘটনা বিন্যাস মেলোড্রামাটিক হইলেও, নাটকখানি ট্র্যাজেডিই বটে।

ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার স্বরূপ লক্ষণ সম্মুখে রাখিয়া এইবার 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের জাতি নির্ধারণ করার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ—সিরাজদ্দৌলার নায়ক হইবার যোগ্যতা আছে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যাউক। বংশ মর্য্যাদার দিক দিয়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার, নবাব সিরাজের যোগ্যতা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—সিরাজের নৈতিক যোগ্যতা-সম্পর্কে। এখানেই স্মরণীয়—সিরাজদ্দৌলার চরিত্রে ইতিহাস যত কালিমাই লেপন করিতে চেষ্টা করুক,—ইতিহাসের মূখর ভাষণের—লিখনের উপরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন জয়ী হইয়াছে।

সিরাজকে বাঙালী বা ভারতবর্ষীয়রা দেশের শেষ স্বাধীন নবাবের মর্যাদা দিয়াছে—সিরাজের—অপরিণত বয়সের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি দোষগুলি ভুলিয়া গিয়া স্বাধীনতা-প্রীতি ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ প্রভৃতি গুণের মহিমা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ নাটকে যে-সিরাজদ্দৌলা রূপায়িত হইয়াছে, তাহা এই **স্বাধীনতাকামী সমন্বয়নীতিবাদী** ও **ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষী** সিরাজদ্দৌলাই। বলা বাহুল্য, তাঁহার শত দোষের তুলনায় এই, কয়েকটি গুণের ভার অনেক বেশী। এই আদর্শ পরায়ণতার মধ্যেই সিরাজের নৈতিক-যোগ্যতা নিহিত আছে। এই গুণের জন্যই সিরাজ সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তথা ট্র্যাজেডি নায়কের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। অতঃপর:—**সিরাজের ভাগ্য-বিপর্যয়ের জন্য সিরাজের কোন দায়িত্ব আছে কি না** এই প্রশ্নের আলোচনা করা যাউক। দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে—innocent person ও নায়ক হইতে পারে। এখানে অবশ্য সে কথা উঠে না। সিরাজ-চরিত্রে যেমন দেখান হইয়াছে—অন্তর্নিহিত দুর্বলতা (frailty) তেমনি পাওয়া যায়—'error of Judgement বা বিচার-ভ্রান্তি।

আলিবর্দী বেগমের মুখে যেমন শোনা যায়—

"ভালমন্দ না করি বিচার,
যেই কার্য যেইক্ষণে উঠে তব মনে
সেই কার্য্য সেই দণ্ডে কর সমাধান।"

তেমনি সিরাজের নিজের মুখেও শুনি......"মাতামহ, কেন ক্রোধ দমন করতে শিক্ষা দাও নাই! এই ক্রোধেই আমার মনোভাব ব্যক্ত করে।" এই স্বভাবের বশেই, সিরাজ জগৎশেঠের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেন, মীরজাফর প্রভৃতিকে কটুকথা বলেন তথা শত্রুর-ষড়যন্ত্রকে ত্বরিত করিয়া তুলেন—এই স্বভাবের ফলেই সিরাজ 'ক্রোধের বশীভূত হয়ে ওয়াটসকে অপমান" করেন এবং শেষ পর্যন্ত যাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন সেই ইংরেজের প্রতি বিরূপ আচরণ করিতে ইতস্ততঃ করেন না। স্বভাবের এই ত্রুটির জন্যই সিরাজের ঘরে বাইরে যে সকল

শত্রু ছিল, দলবদ্ধভাবে সিরাজের বিরুদ্ধতা করিতে অগ্রসর হয়। তারপর 'error of Judgement" ও সিরাজ কম করেন নাই। 'কুটিলতা কুটীল না করিবে বর্জন—জানিয়াও যাঁহাদের "হাসি পাশে লুক্কায়িত অসি" সেই সব কৃষ্ণসর্প অমাত্যদের গৃহে স্থান দিয়াছেন অবস্থা অবস্থাচক্রে দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কবিমচাচা ভ্রান্তিটা ঠিকই ধরিয়াছে "নবাব মন ছেড়ে খালি ভাবছেন এ করি কি ও করি [* হ্যামলেটের মত—To be or not to be ?] এই দু'নৌকোয় পা দিয়েই প্যাঁচে পড়েছে।.........."রোক করে হুকুম ঝাড়লে ধরপাঁচ ওয়ায় যা হবার একটা হ'য়ে যেত.........." "রাগে দু' কথা বলে, আবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ে ধ'রে সাধে—এই দু'নৌকোয় পা দিয়েই ছোঁড়া মরতে ব'সেছে। যদি তেরিয়া হ'য়েই চ'লতো, যাহোক চোটপাট একদিক দিয়ে এক রকম হয়ে যেতো।" বাস্তবিক সিরাজদ্দৌলা মীরজাফর প্রভৃতির সহিত ব্যবহারে বেশী একটু কড়া হইলেই, ষড়যন্ত্রের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। অন্ততঃ পলাশীতে যে মীরজাফর প্রভৃতি দেশদ্রোহীরা যুদ্ধের অভিনয় করিবার অবকাশ পাইত না—এ কথাটি বলা যায়। সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মূলে—error judment-এর ক্রিয়ার অংশ নগণ্য নহে—বরং এই কথাই বলা সমীচীন যে, অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা অপেক্ষা বিচার ভ্রান্তিই অধিকতর দায়ী। "অন্তরের ছুরী কাহারও লুক্কায়িত নাই" জানা সত্ত্বেও, কপট ও লোভী মীরজাফরের সম্মুখে বক্ষোদেশ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সিরাজ নিজের দুর্বিপাককে নিজেই যেন ডাকিয়া আনিয়াছেন। অবশ্যই বলা যাইতে পারে—মহম্মদীবেগ যে কৃপাণ দ্বারা সিরাজকে হত্যা করে, মীরজাফরের কোষাগের মধ্যেই তাহা লুক্কায়িত ছিল।

তারপর—বিচার করা যাউক * ক্রিয়াতৎপরতার (action) রূপটিকে। ক্রিয়াতৎপরতার রূপ আসলে পরিস্থিতির সহিত নায়কের বুঝা-পড়ার চেষ্টার বৈশিষ্ট্য। যেখানে নায়ক পরিবেষ্টনীর প্রতিকূলতা ও সঙ্কট (Crisis) এড়াইবার জন্ম দৈহিক-মানসিক উদ্যম করেন সেখানে নায়ককে বলা হয় ক্রিয়াশীল আর যেখানে নায়ক পরিবেশের নাগপাশ বন্ধনে নিরুপায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দুঃখদুর্ভোগের অতল আবর্তে ডুবিতে থাকেন এবং হাহাকার বা আর্তনাদ করিতে থাকেন অথবা পরিবেশ হইতে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া কর্মোদ্যমের অবকাশ থাকিলেও, অন্তরাত্মার অভিমান হারাইবার বেদনায় হাল ছাড়িয়া দিয়া, আত্মপীড়ন করিতে করিতে নিজেকে সর্বতোভাবে নিঃশেষ করিতে থাকেন, সেখানে নায়ককে বলা হয়—নিষ্ক্রিয়। বিখ্যাত সমালোচক **ব্রুনেতিয়ের** ক্রিয়াশীলতা বলিতে যদিও striving towards a goal"-এর প্রতিই ঝোঁক দিয়াছেন এবং ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে নাটকে আমরা ব্যক্তি-এষণাকেই (will) বিশেষ পরিস্থিতির সহিত সংগ্রাম করিতে দেখি এবং এই সংগ্রাম "conflict" সেখানেই তীব্রতর যেখানে যেমন পরিস্থিতির প্রতিকূলতা তেমনি নায়কের উদ্যম, উভয়ই জোরালো। যে নাটকে এষণা (will) সংগ্রাম করিতে করিতে শেষপর্যন্ত দুর্ভেদ্য বা অজেয় পরিবেশের কাছে বিপর্যস্ত হইয়া যায় সেই নাটকই ট্র্যাজেডি। অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে—**'ব্রুনেতিয়ের'র** ক্রিয়াশীলতার লক্ষণটি কোন কোন ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হইলেও, সর্বক্ষেত্রে যে সুপ্রযুক্ত নহে, **উইলিয়াম আর্চার** তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ব্রুনেতিয়ের-মতে-নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিও যে ট্র্যাজেডির নায়ক হইয়াছে তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। যাহা হউক—এ ক্ষেত্রে আমাদের আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই।

সিরাজদ্দৌলা-নাটকে সিরাজদ্দৌলা যে up against something'-এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং যে যে পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা যে ট্র্যাজেডি যোগ্য পরিস্থিতির মতই, জটিল ও দুর্ভেদ্য ব্যূহবিশেষ তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। ট্র্যাজেডির পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে 'inescapability'র কথা বলা হয়, তাহা এই পরিস্থিতিতে আছে। একদিকে রাজবল্লভ জগৎশেঠ মীরজাফর ঘসেটি-বেগম এবং অন্যদিকে সলকরজন এবং ফিরিঙ্গি বণিকদল মিলিয়া যে ষড়যন্ত্রের বলয় রচনা করে তাহার বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলে যেমন মৃত্যু আবার দাঁড়াইলেও—"পলাশী এবং মহম্মদী-বেগের তরবারির নিষ্ঠুর আঘাত।

সিরাজদ্দৌলা-নাটকের পরিস্থিতি-বিন্যাসে এই অপরিহার্য্য বেষ্টনী সৃষ্টি করা হইয়াছে—এ কথা বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় ঘসেটির ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি ভাঙিবার পরেই সওকৎজঙ্গ-সমস্যা দেখা দেয়, সেই সমস্যা আপাততঃ মিটিতে না মিটিতেই ইংরেজবণিক-সমস্যা ঘোরালো হইয়া উঠে। এই সব সমস্যার সমাধান না করিলেই নহে অথচ করিতে যাওয়ার পরিণতি—ঘরে-বাহিরে শত্রু-শিবির সৃষ্টি করা—বিশ্বাসঘাতকদিগের চক্রান্তের কাছে অগত্যা আত্মসমর্পণ করা তথা নিজের শোচনীয় শেষপরিণতির দিকেই ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া।

ঘসেটিবেগমের ষড়যন্ত্র-ঘাঁটি আক্রমণের পর—হইতে মহম্মদীবেগের তরবারির তলে শির বাড়াইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত ইতিহাসের এবং নাটকের উভয় সিরাজই অনিবার্য্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ও মর্মন্তুদ পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিয়াছেন।

পরিস্থিতির মধ্যে এইরূপ অনিবার্য্যতা থাকায়—নায়কের সংগ্রামের রূপে একটা 'sight of a loosing struggle-এর দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ট্র্যাজেডি-সংবিতের 'বোধ'-অংশে 'নিরুপায় ও নিষ্ফল সংগ্রামের' ধারণা—এবং নায়কের দুঃখদুর্দ্দশা-দুর্ভোগ যে সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত নহে এইরূপ একটা বিশ্বাস, আবশ্যক। সিরাজদ্দৌলার কর্মপ্রচেষ্টায় 'sight of a loosing struggle'র রূপটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিস্থিতিজনিত সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সিরাজ যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার সঙ্কট কমে তো নাইই বরং আরো জটিল ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। মীরজাফর—জগৎশেঠ প্রভৃতির স্বরূপ জানিয়াও অবস্থাগতিকে বার বার তাঁহাদের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। এই নিরুপায় আত্মসমর্পণই তাহাকে শত্রুর ষড়যন্ত্রের কাছে বেশী করিয়া উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া সিরাজ নিষ্কৃতিলাভের যে উপায় অগত্যা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা এক হিসাবে যেমন খুবই সঙ্গত বা স্বাভাবিক হইয়াছে তেমনি তাহাই সিরাজকে সঙ্কট-আবর্ত্তের গভীরতর তলে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

এইরূপ অবস্থার মধ্যে যে নিরুপায়তা রহিয়াছে, ট্র্যাজেডি-সংবিত্তের তাহা অন্যতম ও প্রধান উপাদান। সিরাজদ্দৌলা নাটকে এই উপাদানটি বিশেষভাবেই বর্তমান। সুতরাং বলা যায়—ট্র্যাজিক ইম্প্রেশনের মনস্তাত্ত্বিক শর্তটি এখানে পূরণ করা হইয়াছে। * তারপর—নাটকের পরিণতিও 'unhappy-ending'এ ট্র্যাজেডির মত বিষাদময়।

সুতরাং বাহ্য-লক্ষণের দিক দিয়া, সিরাজদৌলার ট্র্যাজেডিত্ব অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। এখন প্রশ্ন—ট্র্যাজেডির প্রাণপ্রাচুর্য ও মনস্বিতা নাটকে আছে কি না?—অন্যভাবে বলিলে—নাটকখানি মেলোড্রামার স্তর অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে কি না। এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রথমেই 'নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার'—গ্রন্থের (দ্বিতীয় খণ্ডের) ভূমিকায় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে চাহি—ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "সুতরাং কারণের দিকে খুব বেশী ঝোঁক না দিয়া নায়কের আচরণের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়াটি বিবেচনা করিলে প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হইতে পারে। * আমাদের দেখিতে হইবে যে যে-দিক দিয়াই নায়কের জীবনে দুর্দৈবের অভিঘাত প্রবেশ করুক না কেন, তাহার আচরণে উপযুক্ত মর্যাদা বোধ, ভাব-গম্ভীরতা ও চরিত্রের মহনীয়তার নিদর্শন স্ফুরিত হইয়াছে কি না।" উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—কারণ বাহ্য-লক্ষণ যাহাই থাকুক শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডি-সংবিদ (Tragic impression) হয় কি না সেইটাই তো বড় কথা। অবশ্য "ট্র্যাজিক ইম্প্রেশন" নিরালম্ব কোন কিছু নহে। নায়কের ঐকান্তিকতা সংগ্রাম ও লক্ষ্যের মহত্ত্বের সহিত উহার নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। আদর্শ বা লক্ষ্য যেখানে মহৎ, সংগ্রাম যেখানে ঐকান্তিক এবং ভাগ্য-বিপর্যয় বা পরিণতি যেখানে শোচনীয়, সেখানে বাহ্য-লক্ষণের খুঁটিনাটি অপূর্ণতা থাকিলেও,—ঘটনায় ছোটখাট মেলোড্রামা-সুলভ অবাস্তব আকস্মিকতা ও বোমাঞ্চকরতা থাকিলেও,—নাটককে ট্র্যাজেডির মর্যাদাই দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শাস্ত্রকারগণও সেই কথাই বলিয়াছেন—যেখানে নাটক

merely physical"-এর সীমা পার হইয়া—"inner quality"-এর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে আর নাটককে যেনোজাপা বলে চলে না। এই "inner quality"—মানে—"opposed to merely physical"

সিরাজদ্দৌলা-নাটকের "ideational Value"-র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে—নায়ক সিরাজদ্দৌলাকে নাট্যকার, আলিবর্দ্দী-দৌহিত্রের সংকীর্ণ সত্তার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নাই—ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার তথা সিংহাসন রক্ষার পরিধির মধ্যেই তাঁহার সংগ্রামের আদর্শকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেন নাই, সিরাজদ্দৌলাকে তিনি বাঙলার শেষ ও সংগ্রামী স্বাধীন নবাবের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তথা সমগ্র বাঙালী জাতির রাষ্ট্র-প্রতিনিধি হিসাবেই দাঁড় করাইয়াছেন। ব্যক্তি-স্বার্থ সিদ্ধ করাই সিরাজ-জীবনের উদ্দেশ্য নহে, সিরাজের উদ্দেশ্য ফিরিঙ্গিদিগের গ্রাস হইতে বাংলার তথা দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এইজন্য সিরাজ "বিশেষ" হইয়াও নির্বিশেষ। অধ্যাপক মিকর্ণ Abraham Lincon সম্বন্ধে যে কথাটি বলিয়াছেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা চলে—সিরাজ—"is a force symbolized in a man"। এখানেও—"a desire on the part of the dramatist to soften the sense of independent individuality"—বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাস্তবিক ব্যক্তি এখানে সাধারণীকৃত। ব্যক্তি-সিরাজ যেন অভিধামাত্র আর নবজাতীয়তাবাদী-সিরাজ, ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষী সিরাজ, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব এমন কি সিংহাসন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত—সিরাজ—যেন ব্যঞ্জনা। এই কারণেই সিরাজের আবেগ, সঙ্কট ও সংগ্রাম ও ভাগ্যবিপর্য্যয়, ব্যক্তি-সিরাজের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকে নাই—হিন্দু-মুসলমানের-দেশ সমগ্র বাংলার তথা ভারতের, আবেগ-সঙ্কট-সংগ্রাম-ভাগ্যবিপর্য্যয় হইবার মহিমা লাভ করিয়াছে।

সিরাজ যে—"a force symbolized in a man"—নিম্নলিখিত উক্তিগুলি তাহার প্রমাণ—(ক) "হে অমাত্যগণ! আমায় শত্রু বিবেচনা ক'রবেন না। কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু বাঙলার শত্রু নই…

হিন্দু মুসলমানগণ একস্বার্থে বাঙলায় আবদ্ধ ..যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন পূর্ণিয়ার সওকতজঙ্গের সঙ্গে যোগদান করুন কিংবা বিদ্রোহীর ধ্বজা উড্ডীন করে যোগ্যজনকে সিংহাসন প্রদান করুন। কিন্তু স্থির জানবেন, ফিরিঙ্গি বাঙলার দুশমন (প্রথম অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

(খ) সিংহাসনে হয় যদি সওকত স্থাপিত
বাঙলায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব। বাংলার স্বাধীনতা
কিন্তু সাবধান ও
নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে সূচ-অগ্র স্থান ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ
বঙ্গের সন্তান—হিন্দু মুসলমান
বাঙলার সাধহ কল্যাণ, (নবজাতীয়তা-)
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ মূলক
নাহি হয় ফিরিঙ্গি-নফর —(১মঅঃ—৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

(গ) "যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থচালিত হ'য়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করে সে কুলাঙ্গার। মাতৃভূমির কলঙ্ক। তার জীবন ঘৃণিত।· ("স্বদেশপ্রাণতা" '...৩অ—১১শ গর্ভাঙ্ক)

(ঘ) "যদি কখনও সুদিন হয়, যদি কখনও জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হ'য়ে সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে··· যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি খড়্গহস্ত হয়—এই দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব, নচেৎ অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য।"

উল্লিখিত উক্তিগুলির মধ্যে সিরাজের যে ব্যক্তিত্ব—আদর্শবাদিতা ও সঙ্কল্প প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সিরাজকে যথার্থই—'a force symbolized in a man' বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই ভাবরাজি সিরাজের সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মা এবং এই কারণেই সিরাজদ্দৌলা-নাটক শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার উপস্থাপনা মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই—জাতির বাসনা-কামনা, নবজাতীয়তার আদর্শকে রূপায়িত

করিয়া, জাতীয়-জীবনের গভীর উপলব্ধির কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। নাট্যকার শুধু যে সিরাজ-চরিত্রের মাধ্যমেই এই জাতীয় চৈতন্য বা ভাব-সত্যকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, মীরমদন-মোহনলাল করিমচাচা প্রভৃতি চরিত্রকেও মাধ্যম করিয়া সমগ্র নাটকের মধ্যে সিরাজের আদর্শকেই নানা মুখে ব্যাখ্যা ও ঘোষণা করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা চলে—সিরাজদ্দৌলা নাটকে ঘটনা-বিন্যাস কৌতূহল-রসেই শেষ হয় নাই—ঘটনা-বিন্যাসের মধ্য দিয়া গভীরতর ভাবাদর্শ অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। এই ব্যঞ্জনার মধ্যেই নাটকখানির ভাবিক সার্ব্বজনীনতা নিহিত আছে। অবশ্য সার্ব্বজনীনতাও যে আপেক্ষিক এবং উহার মধ্যেও যে স্তর-বিভাগ সম্ভব তাহাও মনে রাখা দরকার। যে ট্র্যাজেডিতে মানুষকে পরাতত্ত্বের (metaphysical) পটভূমিতে দাঁড় করাইয়া মানব জীবনের আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বকে রূপ দেওয়া হয়, সেই ট্র্যাজেডির সার্ব্বজনীনতা এবং একখানি সামাজিক ও ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ট্র্যাজেডির সার্ব্বজনীনতা সর্বতোভাবে একরূপ হইবে ইহা প্রত্যাশা করা অন্যায়। ভাবের সার্ব্বজনীনতার পরিধির অনুপাতে শিল্পের সার্ব্বজনীনতার রূপ ফুটিয়া উঠে এবং ভাবকে যত তীব্র ও গভীরভাবে রূপ দেওয়া যায় তত সৃষ্টির সংবেদন-শক্তির তথা রসোত্তীর্ণতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

এইবার আমরা সিরাজদ্দৌলা-নাটক সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চেষ্টা করি। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে—ট্র্যাজেডি-নায়কের বংশ, কীর্ত্তি, ক্রিয়াতৎপরতা দায়িত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আপত্তি করিবার মত কিছুই নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহাও প্রমাণ করা হইয়াছে যে নাটকখানি অর্থ-গৌরবের দিক দিয়াও নিঃস্ব বা দীন নহে এবং অর্থ-গৌরবের বস্তু সিরাজ—"a force symbolized in a man"। প্রশ্ন এবং শেষ প্রশ্ন—রসোত্তীর্ণতার মাত্রা সম্বন্ধে। যে পরিমাণ রসনিষ্পত্তি ঘটিলে রচনা রসসাহিত্যের মর্যাদা পায় তাহা সিরাজদ্দৌলা-নাটকে অবশ্যই ঘটিয়াছে; তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য—শিল্পকর্মের দৈন্য নাটকে আছে এবং প্রথম-শ্রেণীর ট্র্যাজেডির রসগাঢ়তা বলিতে যেরূপ চমৎকারিত্ব বুঝায় তাহা এখানে

নাই। নাট্যকার ভূমিকাতেই সবিনয়ে তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং নিজের বাধা ও অসুবিধার কথা নিবেদন করিয়াছেন (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং "সিরাজদ্দৌলা" উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্ম না হইলেও ট্র্যাজেডির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা উহার আছে। এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার বড় ট্র্যাজেডি না হইলেই যে তাহা মেলোড্রামা হইবে এমন কোন কথা নাই। সিরাজদ্দৌলা উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি নহে এ কথা যত সত্য, তত সত্য এই সিদ্ধান্তটি যে সিরাজদ্দৌলা 'মেলোড্রামা' নহে।

বিচার

(ক) গঠন

* বৃত্ত-বন্ধ বা কাহিনী-যোজনা

বৃত্তবন্ধ বা কাহিনী-সংগঠন-বিষয়ক আলোচনাকে আমরা মোটামুটি নিম্ন-লিখিত ভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি :—

(ক) কাহিনীর গঠন **সরল** (simple) কিংবা **জটিল** (complex)।

* [অবশ্য সরল-জটিল বলিতে এখানে এরিষ্টটল-কথিত লক্ষণই ধরা হইতেছে —* জটিল কাহিনী তাহাই যেখানে ঘটনা-বিপর্যয় (reversal of situation) এবং অভিজ্ঞান-মূলক আবিষ্কারের (Discovery) ব্যাপার থাকে, আর সরল কাহিনী ইহার বিপরীত—উহাতে ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটিয়া যায়—ঘটনার পরাবৃত্তি থাকে না]

(খ) কাহিনী একক অথবা **যৌগিক** (সাবপ্লটযুক্ত)। [ক্লাসিকাল বা রোমান্টিক—এই বিচারেরই অংশ] সিরাজদ্দৌলা নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায়—বৃত্তটি (নির্ধারিত অর্থে) 'জটিল' নহে—সরল অর্থাৎ নাটকের ঘটনা-বিন্যাসে পরাবৃত্তির-(regresson) কোন ব্যাপার নাই ; ঘটনা ক্রম-পরম্পরিত (progressive)। একটি বিশেষ কালে ঘটনার আরম্ভ এবং পর পর যে ভাবে ঘটনা ঘটিয়াছে, সেইরূপ ক্রমান্বয়ে সংবিন্যস্ত হইয়াছে। তারপর—'খ'—সূত্রের দিক দিয়া দেখিলে কাহিনীটি **যৌগিক**। সিরাজদ্দৌলার জীবনে 'পনের মাসের' মধ্যবর্তীতে যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাদের একটি **ব্যক্তি-এককতার** সূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে। এখন, 'প্রধান কাহিনী' ও উপকাহিনীর হিসাব-নিকাশ করিতে গেলে দেখা যায়—সিরাজদ্দৌলার কাহিনীর সহিত ঘসেটি-বেগম, সওকৎজঙ, রাজবল্লভ-কৃষ্ণবল্লভ, জগৎশেঠ-উমিচাঁদ—ইংরেজ বণিক ও ফরাসী বণিক-সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ইহাদের ক্রিয়াকলাপ সিরাজ-

কাহিনীর অপরিহার্য্য উপাদান। সুতরাং প্রধান কাহিনীরই অঙ্গ। আমরা দেখি—প্রধান কাহিনীর ঘটনাধারা—ঘসেটি-বেগমের ষড়যন্ত্রঘাঁটি মতিঝিল আক্রমণ—মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতির পদচ্যুতি ও পুনর্বহাল—সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান—রাজমহল হইতে প্রত্যাবর্তন, কলিকাতা আক্রমণ ও কলিকাতা জয়—কৃষ্ণবল্লভকে ক্ষমা—সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও যুদ্ধে জয়লাভ কলিকাতা পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা ও ইংরেজের সহিত সন্ধি··· ইংরেজের সন্ধি-ভঙ্গ-করা—সিরাজের ক্রোধ··· ··ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান···পলাশীতে পরাজয়—পলায়ন—বন্দীদশা—মহম্মদীবেগের তরবারি-আঘাতে শোচনীয় মৃত্যু। এই সকল ঘটনা বাদ দিয়া সিরাজের কাহিনী গঠন করা সম্ভব নহে এবং সেই দিক দিয়া বলা যায় যে **সিরাজ-কাহিনী স্বরূপতই যৌগিক**···বহুপক্ষীয় ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমবায়ে উহা গঠিত। কিন্তু প্রশ্ন এই যে **"পক্ষের"** অবতারণা বা বিস্তারকে আমরা উপকাহিনী-যোজনা বলিতে পারি কি না? একাধিক বৃত্তান্ত লইয়া 'সিরাজের' বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ। সেদিক দিয়া ঘসেটি-বৃত্তান্ত, সওকৎজঙ্গ-বৃত্তান্ত, রাজবল্লভ-কৃষ্ণবল্লভ-বৃত্তান্ত, মীরজাফর-বৃত্তান্ত, জগৎশেঠ-মাণিকচাঁদ-বৃত্তান্ত, ইংরেজবণিক-বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা বৃত্তান্তের সংযোগে সিরাজ-বৃত্তান্ত যৌগিক। কিন্তু উপকাহিনী (sub-plot) কথাটি একটু বিশেষ অর্থেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

যেখানে পারিপার্শ্বিক পাত্র-পাত্রীকে প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্রের সহায়কমাত্র করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয় না, তাহাদের চরিত্র-বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র একটা কক্ষ-পথে বিবর্তিত করা হয়—তাহাদের কেন্দ্র করিয়া ছোটখাটো কাহিনীর উপবৃত্ত রচনা করা হয়, সেখানেই "উপকাহিনী"র সৃষ্টি হয়। সেই হিসাবে—সিরাজদ্দৌলায় [বিদেশী বণিক পক্ষের এবং স্বদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের কথা বাদে] 'জহরা-কাহিনী' এবং 'করিমচাচা' কাহিনীকে—আমরা 'উপ-কাহিনী'র মর্য্যাদা দিতে পারি। ঘসেটি-বৃত্তান্তের সহিত জহরা-উপকাহিনীর যোগ থাকিলেও উহা স্বতন্ত্র এবং করিমচাচা অনেকটা পার্শ্বচরিত্র হইলেও

উপকাহিনীর মতই একটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য লইয়া বিরাজ করিয়াছে। জহরা-কাহিনীর উৎস (হোসেনকুলির স্ত্রী) যাহাই হউক, কাহিনীটির অবতারণার প্রয়োজন যাহাই থাকুক, কাহিনীটি নাটকখানির নাটকীয়ত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করিলেও ঐতিহাসিক বাস্তবিকতার মাত্রা হ্রাস করিয়াছে। করিমচাচার—কাহিনী নাটকের সম্পদ তাহা তথা নাটকের ভাব গৌরবের সহায়ক হইয়াছে—এক কথায়, প্রশংসনীয় সংযোজনা।

সন্ধি-বিন্যাস

সিরাজদ্দৌলা নাটকের সন্ধি-বিন্যাস পর্যালোচনা করিবার আগে প্রথমেই নাটকের স্থূল-শরীরটাকে—কাহিনীর পর্বগুলিকে—চোখের উপর রাখা দরকার; দেখা দরকার, নাট্যকার কেন্দ্রীয় চরিত্রটির এষণাকে (will) কোন্ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য প্রধানতঃ স্থাপিত করিয়াছেন। এখানে দেখা যায়—একটা ষড়যন্ত্রের ব্যূহের মধ্যে নায়ক দণ্ডায়মান। এই ব্যূহের কোন ব্যূহাংশ নায়কের কাছাকাছি, কোনটি একটু দূরে—ছদ্মরূপে অস্পষ্ট। এই ব্যূহ হইতে নিষ্ক্রমণের চেষ্টাই সিরাজের মুখ্য-সংগ্রাম। ইহার এক মুখ ভেদ করিতে যাইয়াই, ঘসেটির ষড়যন্ত্র ঘাঁটি-ভঙ্গ করিতে গিয়াই—ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পর্ব শেষ হয়—এবং গরম লড়াই সুরু হইয়া যায়। তবে সিরাজদ্দৌলা নাটকে যদিও আভ্যন্তর নায়কের সংগ্রামের রূপটি দেখান হইয়াছে, তবু নাটকে নায়কের প্রধান সংগ্রাম ইংরেজ বণিকের বিরুদ্ধেই। গোড়ার দিকে ঘসেটি ও সওকৎজঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বী বটে, কিন্তু মূল সঙ্কট বা সমস্যা সওকৎকে লইয়া নহে—ষড়যন্ত্রের এবং ইংরেজ-বণিকের স্পর্দ্ধিত আচরণ লইয়াই; নাটকে ফিরিঙ্গি-শক্তিই সিরাজের প্রধান বাহ্য-পরিবেষ্টনী। ঘর-শত্রুরা শত্রু বটে, কিন্তু বাঙলার স্বাধীনতার প্রধান শত্রু "ফিরিঙ্গি"; পূর্বেই বলা হইয়াছে—সিরাজদ্দৌলা নাটকের—ধ্রুবপদ "ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার দুশমন"। তাহারা সব—"বিদেশী দস্যু"। এই কারণেই নাটকে সন্ধি বিভাগ প্রধানতঃ—ইংরেজ-শক্তির সহিত বুঝাপড়াকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দিক দিয়া দেখিলে—প্রথম অঙ্কে—ইংরেজকে শায়েস্তা করিবার জন্য সিরাজের কলিকাতা আক্রমণ,

দ্বিতীয় অঙ্কে—ইংরেজের কলিকাতা পুনরধিকার—সন্ধি-প্রস্তাব……ষড়যন্ত্রকারী চক্রান্তে সন্ধি-পত্র-স্বাক্ষরে বিভ্রাট,—যুদ্ধ, নবাবের পরাজয় ও সন্ধি-প্রস্তাব। **তৃতীয় অঙ্কে**—ইংরেজের ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র—ফরাসী-বিতাড়নের দাবী…… সিরাজের প্রতিক্রিয়া…কিন্তু শেষ পর্যন্ত পত্রের প্রস্তাব স্বীকার…মীরজাফরের সহিত ইংরেজের চুক্তি…ক্লাইবের যুদ্ধ-প্রস্তুতি…**চতুর্থ অঙ্কে**…পলাশী-যুদ্ধ …ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয়—অগত্যা প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন ··লাৎফার সহগামী…ধরাপড়া। **পঞ্চম অঙ্কে**…সিরাজকে হত্যা করা …মুর্শিদাবাদে ক্লাইবের অভ্যর্থনা…ক্লাইবের আচরণে মীরজাফরের ক্ষোভ… (ইংরাজের আধিপত্য সূচনা)। অবশ্য সিরাজদ্দৌলা-কাহিনীর যৌগিকতার কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না—সিরাজদ্দৌলাকে একই সময়ে দুই সীমান্তে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে—একদিকে গৃহশত্রুর-বিরুদ্ধে, অন্যদিকে—বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে। গৃহশত্রুর দলে—রাজবল্লভ-রায়দুর্লভ উমিচাঁদ জগৎশেঠ প্রভৃতি হিন্দু-প্রধানগণ ও মীরজাফর; বহিঃশত্রুর দলে—প্রথম প্রতিপক্ষ ঘসেটি, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সওকৎ-জঙ্গ, তৃতীয় প্রতিপক্ষ—মীরজাফর-সহায় ইংরেজ। প্রথম অঙ্কেই সিরাজ—তিন পক্ষেরই সম্মুখীন, ঘসেটি ও সওকৎজঙ্গের পরে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন।

ঘসেটি-দমন, সওকৎ-প্রশমন ও ইংরেজ-দমনের পরে সওকতের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন…এতগুলি ঘটনা লইয়া নাটকের **মুখ-সন্ধি**। • **প্রতিমুখ-সন্ধিতে** —সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ও জয়লাভের পরে—গৃহশত্রুর চক্রান্ত, ইংরেজের কলিকাতা-অধিকার…সন্ধিপ্রস্তাব·· সন্ধিপ্রস্তাবে চক্রান্তকারীদের বাধা-দান—শেষ পর্যন্ত সিরাজের সন্ধি-প্রস্তাব স্বীকার · তথা ইংরেজের কাছে বেশ খানিকটা আত্মসমর্পণ • **গর্ভ-সন্ধিতে**…সিরাজের কাছে ইংরাজের দর্পপূর্ণ পত্র এবং পত্রে ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রস্তাব…সিরাজের ইংরাজ-বিরোধী তীব্র প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীদের কুমন্ত্রণায়, ফরাসী-বিতাড়নে সম্মতি…তথা নিরুপায় ভাবে ইংরেজের ফাঁদে পাইয়া পড়া…ধৈর্য্য হারাইয়া

সিরাজের জগৎশেঠ মীরজাফর প্রভৃতিকে তীব্র ভর্ৎসনা...ষড়যন্ত্রের পরিণতি—মীরজাফরের ইংরেজকৃত-চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা.....সিরাজের শেষ error of judgement—বিষকুম্ভ মীরজাফরের কাছে আত্মসমর্পণ, কপট মীরজাফরের কোরাণ স্পর্শের উক্তিতে বিশ্বাস। **বিমর্ষ-সন্ধিতে** পলাশী-প্রান্তরে সিরাজের পরাজয়—ইংরেজের জয় এবং উপসংহারে—সিরাজের শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয় ও পরিণতি—ক্লাইবের-গর্দভ মীরজাফরের ক্লাইবের হাতেই অপমান—ইংরেজের মানদণ্ডের রাজদণ্ডে পরিণতি—বাঙলার তথা ভারতের স্বাধীনতা-সূর্যের অস্তগমন।

অঙ্ক ও দৃশ্য-বিভাগ

এই সন্ধি-বিভাগ অঙ্ক-বিভাগের সহিত এক হইয়া আছে। পাঁচ অঙ্কে—পাঁচটি সন্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে বহুঘটনাকে একত্র করিতে যাইয়া প্রত্যেক অঙ্কে বহুসংখ্যক দৃশ্য যোজনা করিতে হইয়াছে। এক্ষেত্রে আলোচনায় নাট্যকারের নিবেদনটুকু অবশ্যই স্মরণীয়। "আলিবর্দীর সময় হইতে সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় পরিণাম পর্যন্ত যে সকল স্বার্থচালিত ঝঞ্ঝাপূর্ণ ঘটনা প্রভাবে বঙ্গ-সিংহাসন আলোড়িত হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র প্রদর্শন ব্যতীত সিরাজদ্দৌলা নাটক প্রস্ফুটিত হয় না।...সিরাজ চরিত্র লইয়া দুইখণ্ড নাটক লিখিতে প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইতে পারিত।"

প্রথম অঙ্কে অর্থাৎ মুখ-সন্ধিতে সিরাজদ্দৌলার নাগপাশ-সদৃশ জটিল পরিস্থিতিকে স্থাপিত করা হইয়াছে। **প্রথম গর্ভাঙ্কে** ঘসেটি-বেগম...রায়দুর্লভ-মীরজাফর প্রভৃতির মনোভাব ও পদচ্যুতি। **দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে** আলিবর্দী বেগমের অনুরোধে...শত্রুদের কাছে সিরাজের ক্ষমা-প্রার্থনা ও তাহাদিগকে পদাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা। **তৃতীয় গর্ভাঙ্কে**—সওকৎজঙ্গের ব্যাপারে সওকৎজঙ্গের সহিত মীরজাফরের ষড়যন্ত্র...**চতুর্থ গর্ভাঙ্কে**—সিরাজের পারিবারিক জীবনের দৃশ্য এবং কাশীমবাজার কুঠি আক্রমণ, ওয়াটসেরও কেরাণীর বন্দীদশা ও মুক্তির পরোক্ষ উপস্থাপনা। **পঞ্চম গর্ভাঙ্কে**...কলিকাতা

আক্রমণের মন্ত্রণা ও উদ্যোগ…জগৎশেঠ মীরজাফর প্রভৃতির সহিত ইংরেজের গোপন সম্পর্ক…(প্রজাপ্রাণ ও স্বজাতিবৎসল ও স্বাধীনতা-প্রাণ সিরাজের রূপ) * **ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে** ..ইংরেজের হস্তে কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদের লাঞ্ছনা। **সপ্তমে** কলিকাতা-আক্রমণের পরোক্ষ উপস্থাপনা। ***অষ্টমে** ..ইংরেজের আতঙ্ক… কলিকাতা-যুদ্ধের রূপ। **নবমে** 'হলওয়েল'-বন্দী। **দশমে**—ইংরেজ-বন্দী সিরাজের দরবার সিরাজের হলওয়েল কৃষ্ণদাস প্রভৃতির সহিত উদার ব্যবহার। * (করিমচাচা-চরিত্রটির অবতারণা) **একাদশে** :— সিরাজের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টায় দানসার প্রয়োগ, দানসার বন্দীদশা, * **দ্বাদশে**—*("অন্ধকূপ"-কাহিনীর খণ্ডন), দানসার নাসা-কর্ণচ্ছেদন, সওকৎজঙ্গের পত্র . সিরাজের সমক্ষ আনয়নে জগৎশেঠের কারসাজি · জগৎশেঠকে চপেটাঘাত করায় রায়দুর্লভ মীরজাফরের প্রতিবাদ…

আলিবর্দী বেগমের অনুরোধে সকলের কাছে সিরাজের ক্ষমা প্রার্থনা… আপাততঃ বোধ শান্তি এবং সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ। * এই অঙ্কে নাট্যকার শুধু পরিস্থিতি গড়িয়াই তুলিয়াছেন তাহা নহে—ভাবী ঘটনার সমস্ত বীজই স্থাপনা করিয়াছেন।

যে সকল রাজনৈতিক ঘটনা সিরাজের পরিস্থিতি বা পরিবেষ্টনী রচনা করিয়াছে এবং যাহারা সিরাজকে ক্রমে জটিলতর পরিবেষ্টনীর সম্মুখীন করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই এখানে আছে। অধিকন্তু, ঘসেটিবেগমের "[illegible]" দাসীর সাহায্যে ধন রত্ন অপসারণ এবং পরে ষড়যন্ত্রে অর্থ-সাহায্যে পুষ্ট করা'র ইতিহাস-টুকুকে রূপ দেওয়ার চেষ্টাও করিয়াছেন—"জহরা"-চরিত্রে নাট্যকার বিশ্বস্তা-দাসী" এবং হোসেনকুলি-স্ত্রীকে এক করিয়াছেন এবং গোড়াতেই জহরাকে উপস্থিত করিয়াছেন। তারপর দ্বিতীয় কাল্পনিক চরিত্র—করিমচাচা সেক্সপীয়রের "ফুল" ও "ফলষ্টাফের" মতই নাটকের অঙ্গবন্ধ না হইলেও, ভাবের আধার হিসাবে অবিচ্ছেদ্য ; সেও তাহার মূল সুর লইয়া এখানে উপস্থিত। তৃতীয়তঃ যে দানসা ফকির সিরাজকে নাক-কাণ কাটার আক্রোশে ধরাইয়া দিয়াছে তাহাকেও রাখ

নৈতিক ঘটনার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে। মোট কথা পরবর্তী ঘটনার সম্ভাবনা প্রথম অঙ্কে ব্যাপক ভাবেই সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই পরিবেশে শুধু যে ঘটনার দিকেই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে তাহা নহে—নাটকের রস ও ভাব পরিমণ্ডলটির দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। তবে এ কথা বলা যায়—নাট্যকারও স্বীকার করিয়াছেন দৃশ্যসংখ্যা কমানো সম্ভব। যেমন সপ্তম গর্ভাঙ্কটি (ষষ্ঠ ও অষ্টমকে নাট্যকার অভিনয় সংক্ষেপার্থ নিজেই বাদ দিয়াছেন) রসে ও রূপে খুবই হেয় এবং নিরর্থক।

দ্বিতীয় অঙ্কে—৬টি দৃশ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে যাহা উপস্থাপিত হইয়াছে তাহার জন্য দুইটি দৃশ্য যোজনার কোন প্রয়োজন নাই। ঘসেটি জহরার ক্রিয়া-কলাপকে অনুচিত প্রাধান্য দিতে গিয়াই এই অপবাদে নাট্যকার নিজকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। **তৃতীয় অঙ্কে**—৫টি দৃশ্য। দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্কটি যথাক্রমে করিমচাচার নাট্যোচ্চারণে এবং মীরমদন-মোহনলালের ভাবোচ্ছ্বাসে—এবং তৃতীয়টি জহরার ভাবোচ্ছ্বাসে বেশ খানিকটা আকাশস্থ হইয়া বাস্তবিকতার দিক দিয়া হালকা হইয়া পড়িয়াছে। **চতুর্থ অঙ্কে**—৬টি দৃশ্য। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ দৃশ্যের গুরুত্ব, জহরার অতিনাটকীয় কায়িক ও বাচনিক আচরণের সংযোগে বেশ খানিকটা কমিয়া গিয়াছে। **পঞ্চম অঙ্কে** ৭টি গর্ভাঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্কটি অবাস্তব না হইলেও অত্যা-বশ্যক নহে। দ্বিতীয়টি—ওয়াটসের মুক্তির প্রতিদানে ওয়াটস-পত্নীর সক্রিয় কৃতজ্ঞতা—কল্পিত। এই হিসাবে দৃশ্যটি কাহিনী কল্পনার দিক দিয়া একেবারে অনাবশ্যক নহে। তৃতীয় দৃশ্যে ওয়াটস-পত্নীর উদারতাকে অস্বাভাবিক না বলিলে অতিশয় বলিতেই হইবে। চতুর্থ গর্ভাঙ্ক—জহরার উপসংহার; বলা বাহুল্য অতিনাটকীয় পরিবর্তনে চমকপ্রদ উপসংহার। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে—ক্লাইভের বিজয়-গর্ব মুর্শিদাবাদ দরবারে প্রবেশের উদ্যোগ এবং ষষ্ঠগর্ভাঙ্কে—মুর্শিদাবাদে দরবার—নাটকের ভাব ব্যঞ্জনায় পরিনতির দিক দিয়া অত্যাবশ্যক। সপ্তম গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য যাহা করুণ সংবেদনা সঞ্চারের চেষ্টা—করুণ মূর্চ্ছনায় নাটকের উপসংহার করা হইয়াছে।

এইবার গীতি-যোজনা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গঠন-বিচার শেষ করা

যাইতে পারে। নাটকে গান আছে প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে ১টি (উম্মৎ জহুরার মুখে) সপ্তম গর্ভাঙ্কে—নাগরিকাগণের মুখে ১টি, একাদশ গর্ভাঙ্কে—নাগরিকাগণের মুখে ১টি (মোট—৩টি), দ্বিতীয় অঙ্কে—প্রথম গর্ভাঙ্কে বন্দীগণের মুখে ১টি, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—লুৎফউন্নিসার মুখে ১টি (মোট—২), তৃতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—নর্ত্তকীগণের মুখে (মোট—১), চতুর্থ অঙ্কে—চতুর্থ গর্ভাঙ্কে লুৎফউন্নিসার মুখে ১ (মোট—১), পঞ্চম অঙ্কে—পঞ্চম গর্ভাঙ্কে নাগরিকের মুখে এবং সপ্তম গর্ভাঙ্কে—লুৎফউন্নিসার মুখে। গীতি-যোজনা অধিকাংশ স্থলেই ঔচিত্য-বিরোধী হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে উম্মৎজহুরার ও নাগরিকগণের গীতি তিনটিই অনুচিত, দ্বিতীয় অঙ্কে গান দুইটি অস্বাভাবিক নহে; তৃতীয় অঙ্কের গানটিও অসঙ্গত মনে হয় না। চতুর্থ অঙ্কের লুৎফউন্নিসার গানটি যাত্রা-সুলভ। পঞ্চম গর্ভাঙ্কের গানটি অবস্থা-অনৌচিত্য দোষ দুষ্ট এবং লুৎফউন্নিসার শেষ গানটি—অস্বাভাবিক। লুৎফার শেষ গানটি সম্পর্কে নবীন সেন গিরিশ চন্দ্রকে পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমি নবযুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক সঙ্গীত প্রথম সংস্করণ 'পলাশীর যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত আসে কিনা বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেই জন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন তোমার। দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।" গান সম্বন্ধে বঙ্কিম যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন আমরাও তাহা করিতে পারি।

সুতরাং গঠন-বিচারের উপসংহারে আমরা এই কথা বলিতে পারি—অতিনাটকীয় ঘটনার সংস্পর্শে এবং অনুচিত গানের উচ্ছ্বাসে নাটকের গঠনটি অনৌচিত্য-দোষ মুক্ত হইতে পারে নাই।

(খ) ক্রিয়া (Action)

কোন নাটকের ক্রিয়া-সামর্থ্য পরিমাপ করিবার আগে প্রথমেই দেখিয়া লইতে হইবে—নাটকের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতিটি কি। কারণ ক্রিয়া-সামর্থ্য আছে কি নাই তাহা হিসাব করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত নাটকখানির ক্রিয়া-প্রকৃতিরই

লক্ষ্য লইতে হইবে...যেরূপ ক্রিয়া-প্রকৃতি সেইরূপ ক্রিয়ার লক্ষণ। ক্রিয়া যেখানে আত্মিক বা মনস্তাত্ত্বিক, সেখানে নাটকের ক্রিয়া-সামর্থ্য বিচার করিতে আত্মিক বা মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার রূপটি হিসাব করিতে হইবে, আবার যেখানে ক্রিয়া পরিবেষ্টনীর বাধার এবং সেই বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টার মধ্যে নিহিত, সেখানে ক্রিয়া-সামর্থ্য বিচার করিবার সময়...পরিবেষ্টনীর বাধার জোর ও জটিলতা এবং সেই বাধা অতিক্রমণের চেষ্টার ঐকান্তিকতা অবশ্যই হিসাব করিতে হইবে। নাটকে যে ক্রিয়ার প্রাধান্য,—ক্রিয়াপ্রাণতা পরীক্ষার সময় সেই ক্রিয়ার তীব্রতাই হিসাব করিয়া দেখা দরকার। অবশ্য এ কথাও মনে রাখা দরকার যে দ্বন্দ্ব যত গভীর হয়—বহির্দ্বন্দ্ব যেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তথা অন্তর্দ্বন্দ্বকে মুখ্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া নিজে গৌণীকৃত হইয়া থাকে সেখানে নাটকের ক্রিয়াপ্রাণতাও তীব্র ও গভীর হয়। তবে ইহাও স্মরণীয়—যেখানে মহান কোন আদর্শের জন্য প্রতিকূল পরিবেষ্টনীর সহিত সংগ্রাম তীব্র আকারে প্রকাশ পায়, অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা না থাকিলেও, বহির্দ্বন্দ্বেই একটা মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়া থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা আবশ্যক—কথাটি এই যে ‘ক্রিয়া’-শব্দটিকে একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, এবং ব্যাপক অর্থে “ক্রিয়া”—“চিত্তাকর্ষকত্ব” অর্থাৎ দর্শকের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার শক্তি।

এই আকর্ষণ-শক্তি কোন স্থলে ঘটনায় বা পরিস্থিতিতে (situation) কোনস্থলে ভাবাবেগে (emotional intensity), কোনস্থলে·· সংলাপে কোনস্থলে কল্পনায় ও ভাবনা গৌরবের মধ্যে নিহিত থাকে। রসাস্বাদন এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ সংবেদনার সামগ্রিক ফল। যতদিক হইতে মানুষের চিত্তকে ‘জেকাইয়া’ রাখা যায় ততটিই রস-সৃষ্টির উপায়...... ততটিই আকর্ষণ-কেন্দ্র ইংরাজীতে যাহাকে বলা যায় ‘interest’। ঘটনা-কৌতূহল, চরিত্র-রহস্য, আবেগের গভীর ও তীব্র সংবেদনা, সংলাপ-রস, অর্থ-গৌরব বা ভাব-মহিমা, দৃশ্য-চমৎকারিত্ব......সব

কিছুই খোটা ক্রিয়া-সামর্থ্যে কিছু কিছু কাজ করিয়া থাকে। সব নাটকে একরকম ক্রিয়া-বৈশিষ্ট্য খুঁজিতে যাওয়া যেমন ঠিক হইবে না, তেমনি একই নাটকে সব দৃশ্যেই একরূপ ক্রিয়ার প্রত্যাশা করিলেও হতাশ হইতে হইবে।

সিরাজদ্দৌলা নাটকের ক্রিয়া-স্বরূপটিকে পর্যবেক্ষণ করিতে গেলে, দেখা যায়—নাটকের ক্রিয়ার সাধারণ প্রকৃতিটি বহির্দ্বন্দ্বাত্মক অর্থাৎ জটিল ষড়যন্ত্র-ব্যূহ হইতে নিষ্ক্রমণের নিষ্ফল সংগ্রামের মধ্যে ক্রিয়া-স্বরূপটি নিহিত। এই ষড়যন্ত্র সাধারণ ষড়যন্ত্র নহে—শুধু ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির ষড়যন্ত্র নহে; এই ষড়যন্ত্র বাংলার স্বাধীন নবাবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র··· দেশের স্বাধীনতাকে বৈদেশিক শক্তির কাছে বিক্রয় করিবার ষড়যন্ত্র। * এই কারণেই এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নায়কের সংগ্রাম বহির্দ্বন্দ্বাত্মক হওয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমময়। নায়ককে ঘিরিয়া যে পরিমাণে আমাদের জাতি-অভিমান বর্তমান সেই পরিমাণে তাঁহার দ্বন্দ্বের প্রতি আমাদের কৌতূহল ও সম্ভ্রম এবং সেই পরিমাণেই তাঁহার নিষ্ফল সংগ্রামে সমবেদনা এবং পরিণতির জন্য শোচনা। তারপর—ক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ দেওয়ার পূর্বে একটা কথা অবশ্যই স্মরণীয় এবং তাহা এই যে নাটকের ক্রিয়াপ্রাণতার পরিমাপ, অনেক স্থলেই সহৃদয়ের হৃদয়বত্তার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

নাটক রচনা-হিসাবে স্বরলিপি-বিশেষ। সুর-সংযোগে যেমন স্বরলিপি প্রাণবন্ত হইয়া উঠে · নাটকেরও তেমনি অভিনয়ের গুণে ক্রিয়াপ্রাণবত্তা প্রকাশ পায়। এক অভিনেতার কাছে যাহা ক্রিয়াহীন, অন্যের কাছে তাহাই ক্রিয়া-পূর্ণ—এইরূপ ঘটনা সর্বত্র এবং সর্বযুগেই দেখা যায়। ইবসেন, শেকভ, বার্ণাডশ' প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকারগণের নাটকের প্রথম অভিনয়ের ইতিহাসে ইহার চমৎকার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। "The plays of Anton Tchekov-এর (মডার্ণ লাইব্রেরী 'নিউ ইয়র্ক'-প্রকাশিত) ভূমিকায় বিখ্যাত নট Eve Le Gallienne সুন্দর একটি কথা বলিয়াছেন······বলিয়াছেন—"To express a truth you must have truth within yourself"। কথাটি বহুমূল্য।

বড় সত্যকে প্রকাশ করিতে হইলে অবশ্যই নিজের মধ্যে সত্যোপলব্ধি চাই। বাস্তবিক, নাটকের ক্রিয়াপ্রাণতা সহৃদয়ের সাক্ষাৎকার-শক্তির উপর যে নির্ভর করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সিরাজদ্দৌলা-নাটকের 'action' বিচার করিবার সময়েও এ কথাটি মনে রাখা চাই।

সিরাজদ্দৌলা-নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বিনীতভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া ক্রিয়াপ্রাণতার মাত্রা নিরূপণে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন—"ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, শেক্সপিয়রের লেখনী-প্রসূত হইলেও, অনেকের মতে স্থানে স্থানে নীরস হইয়া পড়িয়াছে। সে দোষ আমার থাকিবে না, ইহা আশা করা আমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র।" নাট্যকারের এই স্বীকৃতিটুকু এবং শেক্সপিয়রের ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্যই স্মরণীয়। এ কথা মিথ্যা নহে যে ইতিহাসের নীরস ঘটনা পরিবেষণ করিতে যাইয়া নাটকের-ক্রিয়াপ্রাণতা রক্ষা করিবার জন্য শেক্সপিয়রকেও—অদ্ভুত অদ্ভুত চরিত্র এবং অবাস্তব কবি-কল্পনার আমদানী করিতে হইয়াছে—* "চতুর্থ হেনরী" নাটকখানি তাহার বড় দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। (* ফলষ্টাফ্-চরিত্রটি দ্রষ্টব্য)

সিরাজদ্দৌলা-নাটকে নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনা উপস্থাপনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ঐতিহাসিক বিবরণকে মুখ্য উপস্থাপ্য না করিয়া রসের আনুষঙ্গিক করিবার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনা বা তথ্যকে তিনি পাত্র-পাত্রীর ভাবাবেগ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সহিত অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে নাট্যকারের দিক হইতে ঐতিহাসিক বিবরণ শুনাইবার প্রত্যক্ষ চেষ্টা না থাকায় শ্রোতাদের পক্ষে নীরস বিবরণ শুনিবার ক্লান্তিও এখানে তেমন নাই। রসাস্বাদনের সহযোগেই তথ্য চেতনায় অনুপ্রবেশ করে। মোট কথা···ইতিহাসকে নাটক করিতে হইলে তথ্যের যে পরিমাণ রসায়ন অত্যাবশ্যক তাহা নাট্যকার প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। পরিস্থিতি, ঘটনা, চরিত্র, ভাবরস নানা দিকেই কম বেশী কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।

ভাব-গত আবেদনের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। পরিস্থিতি বা ঘটনা-গত আকর্ষণও কম নাই। দেখা যায়…দুই একস্থলে ঘটনার অতিনাটকীয় আকস্মিকতার চমকও দেখা দিয়াছে। চরিত্র রসের দিক দিয়া—বড় বড় গুরুগম্ভীর চরিত্র বাদ দিলে…মহবার প্রতিহিংসাপরায়ণতা, করিমচাচার কমলাকান্তের মত নেশার ও রসিকতার অন্তরালে দার্শনিকতা ও স্বদেশপ্রাণতা, সওকৎজঙ্গের মাতলামি বাচ-নামি-ভরা অপদার্থতা, দানসার বাগ-বৈশিষ্ট্য—খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। বিশেষতঃ করিমচাচার আকর্ষণ অনস্বীকার্য। (৺গিরিশচন্দ্রের 'করিমচাচা' অভিনয় নাকি অবিস্মরণীয় ব্যাপার)। ইহা ছাড়াও, নাটকের মূল বা অঙ্গী রসের আবেদনও কমজোরালো নহে শেষের দিকের করুণরসের আকর্ষণের মাত্রাও উপেক্ষণীয় বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গেই নাটকের রস, চরিত্র, কল্পনা ভাবনা প্রভৃতির মূল্যের কথা উঠে। সুতরাং এখানেই আমরা উহাদের বিশেষ বিবরণ দিতে চেষ্টা করিতে পারি।

রস—মাত্রা

এই নাটকের অঙ্গী রস যে করুণ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নাটকের নায়ক সিরাজদ্দৌলা এই রসের আলম্বন বিভাব। প্রথম দিকে ষড়যন্ত্রের নাগপাশ পরিবেশের সহিত নায়কের নিরুপায় ও নিষ্ফল সংগ্রাম শেষের দিকে পরাজয়, ভাগ্য

অঙ্গী রস

বিপর্যয় ও শোচনীয় পরিণতি। প্রথম দিকের মর্মবেদনা ও শোচনা ক্রমে শোকের আকার ধারণ করিয়া থাকে। **চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয়গর্ভাঙ্কে** (পলাশী, নবাব শিবিরাভ্যন্তর) নৈরাশ্য ও আতঙ্কের সঞ্চারিভাবের সাহায্যে, স্থায়িভাবটি বেশ বর্দ্ধিত হয়। তারপর, মীরমদনের মৃত্যু সমর্থ উদ্দীপনা-বিভাবের কাজ করে। নৈরাশ্য ও আতঙ্কের চরম অভিব্যক্তি দেখা যায়—রণক্ষেত্র হইতে মুর্শিদাবাদে পলায়নে। **চতুর্থ গর্ভাঙ্কে** ভাগ্য বিপর্যয় জনিত আক্ষেপ-অনুশোচনায় স্থায়িভাব আরো প্রবর্দ্ধিত হয়। **ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কের** প্রথম দিকে উন্মৎজহুরা তথা বাৎসল্যকে উদ্দীপক হিসাবে প্রয়োগ করিয়া, পরে ভাগ্য-বিপর্যয়ের আক্ষেপের দ্বারা এবং শেষে আবার উন্মৎ জহুরাকে

'উদ্দীপক' হিসাবে ব্যবহার করিয়া রসনিষ্পত্তির চেষ্টা করা হয়। এখানেই উম্মতের মৃত্যুর পরে সিরাজের মধ্যে যে অনুভাবাদি সৃষ্টি করা হয় তাহা খুবই রসোদ্দীপক। ব্যভিচারী ভাবের শক্তিমান প্রয়োগ পাওয়া যায়—যখন সিরাজ বলেন—"বালিকার মৃত্যু দেখেছি, তোমার মৃত্যু দেখলে শান্তিলাভ করতেম। সিরাজের শুষ্ক ও গভীর শোক সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহার পর শেষ উদ্দীপনা-বিভাব—পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের—মুর্শিদাবাদ কারাগার। সিরাজের অনুতাপ-দহনে 'poetic justice'-এর রূপটি ফুটিয়া উঠিলেও—করুণরসের ধারা ব্যাহত হয় না, বরং অনুতাপটুকু করুণ বিলাপের মতই বেদনা সঞ্চার করে। মহম্মদীবেগের পুনঃ পুনঃ তরবারি-আঘাতের সম্মুখে ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থী কাতর সিরাজ এবং আঘাতের ফলে ভূপতিত সিরাজের…দৃশ্য, ভয়ানক ও অদ্ভুত-মিশ্র করুণের উদ্রেক করে।

সপ্তম গর্ভাঙ্কের দৃশ্যটি—"দীপমালা শোভিত সিরাজের সমাধিমন্দির" মৌন-ভাবে এবং লুৎফার শান্ত বিলাপাত্মক প্রার্থনায় মুখরভাবে করুণকেই উদ্দীপিত করে।

তবে এ কথা কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে রস-সৃষ্টির জন্য যে উদ্দীপনা-বিভাব প্রয়োগ করিয়াছেন সবক্ষেত্রে সেগুলি সমুচিত হয় নাই। উম্মৎ, জহরার কথা ও আচরণ এবং লুৎফার অনুভাবাদি আরো বাস্তবিক করিতে পারিলে রসের তীব্রতা ও গভীরতা আরো বৃদ্ধি পাইত। বাস্তবিকতা অপেক্ষা নাটকীয়তার মাত্রা বেশী ব্যক্ত হওয়ায় রসের উদ্দীপক হিসাবে উহাদের অনবদ্য বলা যায় না। উদ্দীপক-সমূহ আরো বাস্তবিক হইলে এবং অনুভাবাদি আরো অভিব্যক্ত হইলে নাটকখানি উচ্চতর পর্যায়ে উঠিতে সক্ষম হইত। এই

নানাবিধ অপরস

অঙ্গীরসের পরে উল্লেখযোগ্য…ঘসেটিবেগম-হলওয়েল—আশ্রিত রৌদ্ররস মীরমদন-মোহনলাল-আলম্বিত বীররস, জহরা-আশ্রিত অদ্ভুত রস এবং গওহরজান—দানসা—কৃষ্ণদাস-উমিচাঁদ এবং করিমচাচা-আলম্বিত বিবিধ হাস্যরস। (জহরা-চরিত্রের

স্থূল ভাব প্রতিহিংসাপরায়ণতা বটে, কিন্তু উহার গতি-বিধি ও আচরণে দর্শকের মধ্যে বিস্ময়ই প্রাধান্য লাভ করে)। অদ্ভুতরসের পরেই প্রাধান্য পাইয়াছে...

হাস্যরস

হাস্যরস এবং এই রসটি বিচিত্র রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই রসের আলম্বন···মাতাল ও বে-চাল গাওবৎসহ। অর্থ-শূন্য বাক-বিকৃতির সাহায্যে এখানে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। মূর্খ মাস্তিকতা, মাতালের জড়তা ও বাচালতা, অপদার্থের চেষ্টা-বিকৃতি এবং চুপসে-যাওয়া আস্ফালন মিশিয়া চরিত্রটি খুবই হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে। কামেলার ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গীয় ভাষাই হাস্যের প্রধান উদ্দীপক, অবশ্য সৈন্য-সামন্তকে ফুঁ দিয়া-উড়াইয়া-দেওয়া'র কেরামতি দেখান বা নবাব খাওয়ার ব্যাপারে নবাবজাদার দোহাই দিয়া নতুন শাস্ত্র তৈয়ার করিয়া নবাব খাওয়া তথা তওয়াফি করা বাক-বিকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় নাই...শুদ্ধ চেষ্টা-বিকৃতির গুণের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তারপর ১ম অঙ্কের একাদশ গর্ভাঙ্কে···গোড়ার দিকে শুদ্ধ বাক্-বিকৃতি আর শেষদিকে···অতি আস্ফালনের আকস্মিক সঙ্কোচনে···(হাদে, তুমি এমন লোকটা —তামাশা বোঝে না—তামাশা বোঝে না ?—তুমি জান না—জান না কেতাবে লিখ্‌চে নিন্দি করতি হয়, নবাবের শেরমাই যাবে)···শুদ্ধ চেষ্টা-গত বিকৃতির লক্ষণই পরিস্ফুট হইয়াছে। এই রসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আলম্বন

হিউমরিষ্ট,
করিমচাচা

করিমচাচা। ইংরাজীতে যাহাকে হিউমার বলে—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায়—"মুখের হাসি চোখের জল মিশিয়া একপ্রকার অপূর্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি", করিমচাচার উক্তি-আচরণে সেই হিউমারই ব্যক্ত হইয়াছে। করিমচাচার উক্তি-আচরণ নিছক ভাঁড়ামি নহে, তাহাদের—"পশ্চাতে একটা বিশিষ্ট মনোবৃত্তি, জীবন-সমালোচনার একটা মৌলিক সঙ্গতাসঙ্গতিকতা-বর্জনকারী দৃষ্টির পরিচয় দিবে"(বঙ্কিমচন্দ্রে হাস্যরস-প্রবন্ধে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) করিমচাচার "হাসির খোঁচা এক ঝলকে অতর্কিত আলোকের মত (সেই) সমস্ত ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিকে এক মুহূর্তে স্পষ্ট উদ্ঘাটন করিয়া তোলে,

(ঐ)। করিমচাচা যে "দার্শনিকের নিকট আত্মীয় ও সহকর্মী" (ঐ)—এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। (চরিত্র-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)। তাহার বক্রোক্তি ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি বাগ-ভঙ্গিমা ও আনুষঙ্গিক অনুভাব যে হাসি সৃষ্টি করে তাহা নিরর্থক আবেগমাত্রে পর্যবসিত হয় না, তাহাতে জীবনের গভীর সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

চরিত্র

সিরাজদ্দৌলা নাটকে ছোট-বড়, হিন্দু মুসলমান ইংরেজ-ফরাসী এবং নারী-পুরুষ মিলাইয়া পাত্রপাত্রীর সংখ্যা পঁয়ত্রিশ চল্লিশেরও বেশী। পুরুষ পাত্রদের মধ্যে মুসলমান ৮টি, হিন্দু ৮টি—ইংরেজ-ফরাসী ১২টি; আর নারী চরিত্রদের মধ্যে ওয়াট্‌স-পত্নী ছাড়া বাকী সকলেই মুসলমান-জাতীয়।

প্রথমেই বিচার করা যাউক নায়ক-চরিত্র—"সিরাজদ্দৌলা"। সিরাজ "বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব"—ভূতপূর্ব নবাব আলিবর্দীর কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র—ইহা একান্তই সাধারণ এবং বাহিরের পরিচয়; ভিতরকার পরিচয় সিরাজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত। "প্রাক্-নবাব সিরাজ-চরিত্রের পরিচয় সিরাজ নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন

"হিতাহিত ছিল না বিচার
মদ্যপানে করিয়াছি শত শত দুর্নীত ব্যাভার।"

ঘঁসিটে বাঁ আত্মবিবরণীতে সিরাজ চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, মাতাল সওকৎজঙ্গের উক্তি…"নৌকোয় বেড়িয়ে দু'ধারে ভাল ভাল মেয়ে মানুষ দেখেছে—আর বেজায় করেছে"—তাহা সমর্থনই করে। দানশার উক্তি—"বিশখানা নায়ের যদি আবমি ভর্ত্তি করি, দরিয়ার বিচে ডোবাইচে, হাপাইয়ে জল খাইয়ে কেমন মজে দেখ্‌তিচে! ঘরের মদ্দি আদমি পুরে তালা লাগাইয়ে আগুন ধরাইচে, আদমিগুলো জ্বালার চোটে চ্যাচাচ্ছে, শুনচিচে আর

হাসিতেছে।"—উপরোক্ত মন্তব্যেরই অংশ। 'স্তম্ভিত ব্যাপার'—নিঃসন্দেহ। তবে হোসেনকুলি হত্যা নিষ্ঠুর ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও করিমচাচা সিরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া যাহা বলিয়াছেন (৩য় অঙ্ক—২য় গর্ভাঙ্ক) তাহা উপেক্ষণীয় নহে। তারপর ফৈজিকে 'দেওয়ালে-গেঁথে-মেরে ফেলা' অবশ্যই নিষ্ঠুর কার্য্য। মীরজাফর খাঁর সহিত আমরাও বলিতে পারি—'আহা অবলা স্ত্রীলোক তারে দেওয়ালে গেঁথে মেরে ফেল্লে! এমন নিষ্ঠুরও জন্মায়!' কিন্তু করিমচাচা চোখ খুলিয়া দেখিবার জন্য যে টিপ্পনি করিয়াছেন (৩য় অঙ্ক—২য় গর্ভাঙ্ক) তাহাতে ফৈজি-হত্যা মত নিষ্ঠুর ব্যাপারের গূঢ় কারণও ব্যক্ত হইয়াছে এবং সিরাজের অপরাধের ভারটাও হালকা হইয়া গিয়াছে! যাহাই তিনি বলুন—নবাব হইবার আগে যে সিরাজ উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব ছিলেন তাহা একরূপ অবিসংবাদিত সত্য। *কিন্তু নবাব হইবার পরে সিরাজ ভিন্ন ব্যক্তি।—সিরাজ সম্বন্ধে মোহনলাল যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে—"নবাব এখন প্রকৃত প্রজাপালক। বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর যৌবন-সুলভ চপলতা আর নাই; মদ্যপান পরিত্যাগ করেছেন, অসৎ সঙ্গীদের বিদায় দিয়েছেন। প্রজার মঙ্গল তাঁর একমাত্র কামনা।" সিরাজের নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তিও অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই—

"বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ-শয্যায়
শেষ বাক্যে তাঁর—
জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার;
নবাব রাজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে;
প্রজার মঙ্গল কার্য্য সতত সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।
* যথাসাধ্য আত্মসংশোধন
চেষ্টা করি দিবানিশি।"

তারপর শত্রুপক্ষের ধরমচাঁদকে—বিশ্বাস করা যায়, তিনিও বলিয়াছেন—"শওকতজঙ্গের যুদ্ধের পর নবাবের যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে; বিদ্রোহী নয় সকলকে যথাযোগ্য উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছেন।" জগৎশেঠকে পর্য্যন্ত বলিতে শোনা যায়—"যেন বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী যৌবন লাভ করে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে।" করিমচাচা যথার্থবাদী—তিনিও বলিয়াছেন—"আলিবর্দ্দী সিংহাসনটি দিয়ে গেলেন আর সিদ্ধি দিয়ে মদ ছাড়িয়ে, নবাবী চোক্‌টি কেড়ে নিলেন।" নবাব-সিরাজ আত্ম-সংশোধনে-চেষ্টিত সিরাজ—উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব সিরাজ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

একথা মিথ্যা নহে যে সিরাজ বাল্যাবধি চিত্তদমন শিক্ষা করেন নাই, তাহার ক্রোধ…কাম প্রভৃতি প্রবৃত্তি চিরদিনই প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে। সিরাজ খুব সহজ ভাবেই একথা বলিতে পারেন—"বাল্যাবধি আপনাদেরই আদরে আমাদের চিত্তদমন করা শিক্ষা হয়নি। তার দায়িত্ব আপনাদেরই; যদি কখনও কখনও উগ্রতা প্রকাশ করি, সে আপনাদের মার্জ্জনীয় নিশ্চয়।" (২য়—১ম) এখনও সিরাজ ক্রোধনস্বভাব বটে, কিন্তু তাঁহার ক্রোধ সাময়িক উত্তেজনা উৎক্ষেপ মাত্র। মার্জ্জনা-প্রার্থনার স্পর্শ লাগিতে না লাগিতেই তাহা জল হইয়া যায়। শত্রু মুখের প্রশংসার দাম বেশী হইলে রাজবল্লভপুত্র কৃষ্ণদাসের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যাইতে পারে—"নবাব ক্রোধন স্বভাব বটে, ক্রোধ হ'লে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু দেখেছি অতিশয় দোষ করে গিয়ে মার্জ্জনা চাইলে মার্জ্জনা পায়! যতই দোষ থাকুক মেজাজ অতি উচ্চ।" (১ম—৮ম) করিমচাচার কথায় কৃষ্ণদাসের উক্তির সমর্থন আছে—"রাগে দু'কথা বলে, আবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ে ধরে সাধে…।" সিরাজ যখন কৃষ্ণদাসকে বলেন—যৌবন-সুলভ অনেক দোষে দোষী স্বীকার করি কিন্তু কেউ শরণাগত হয়ে আশ্রয় পায়নি বা গুরুতর অপরাধ করে মার্জ্জনা প্রার্থনায় দোষ মাপ হয়নি, বোধ হয় আমাদের শত্রুর মুখেও শুনবে না" তখন মিথ্যা গর্ব প্রকাশ করেন না। ইংরেজ পক্ষের উকীলের মুখেও সিরাজের উচ্চ মেজাজের প্রশংসা শোনা

যায়…"নবাবের উক্ত মেজাজ আমরা সম্পূর্ণ অবগত…নবাব দয়াবান, মার্জনা করিবেন—এই ভরসায় রাজগৃহ পরিত্যাগ করি নাই (৩য়—১ম)।" করিমচাচার ব্যাজস্তুতিতেও তাহা প্রকাশ—"টাকা চাইলে মার, শত্রুতা করলে মাপ—এ ব্যাটা কি নবাব, ছ্যাঃ।" সিরাজের ক্রোধ যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি দপ্ করিয়া নিভিয়াও যায়—এ কথা ঘরে-পরে সকলেই জানিত। এই ক্রোধন-স্বভাবের জন্য—এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্য সিরাজ নিজেও আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন…"মাতামহ, কেন ক্রোধ দমন করতে শিক্ষা দাও নাই! এই ক্রোধই আমার মনোভাব প্রকাশ করে।" মেজাজের এক দিক এই হঠাৎ-ক্রোধে ব্যক্ত, অন্যদিক ব্যক্ত হইয়াছে—এবং আলিবর্দী-বেগমের ভর্ৎসনায়—

"ভাল মন্দ না করি বিচার
যেই কার্য্য যেইক্ষণে উঠে তব মনে
সেই কার্য্য সেই দণ্ডে কর সমাধান।
* * * *
শুনি যুক্তি-ধৈর্য্য নাহিক তোমার।

কিন্তু মেজাজী-সিরাজ ক্রোধনস্বভাব-সিরাজ — আত্মসংশোধন-পরাঙ্মুখ-সিরাজ, সিরাজ চরিত্রের একটি দিকমাত্র, যে যে গুণের জন্য সিরাজ—'a force symbolized in a man' হইয়াছেন সেই সকল গুণের মধ্যেই সিরাজ চরিত্রের আসল দিকটি রহিয়াছে। সিরাজ অল্পবয়স্ক হইলেও অল্পবুদ্ধি নহে—পরিস্থিতি-চেতনা তাঁহার মধ্যে কম নহে। আলিবর্দী-বেগমের গঞ্জনার উত্তরে সিরাজ ঠিকই বলিয়াছেন—

"রাজ্যের অবস্থা তুমি জাননা জননী!
স্বার্থপর আমাত্যসকল
করে সবে স্বার্থ উপাসনা
কারো নাহি মঙ্গল কামনা

ছলে বলে কলে নিজ স্বার্থ অনুসারে
* * * *
সমস্ত মন্ত্রণা যত অমাত্য মিলিয়ে
কি উপায়ে সাধিবে আমার পদচ্যুতি।
কভু বা গোপনে—
ষড়যন্ত্র শওকতজঙ্গ সনে,
কভু দানে ইংরাজে উৎসাহ
উপেক্ষিতে নবাবী প্রভাব।"

ইংরাজ যে ছলেবলে রাজ্য বিস্তার করিতে চাহে তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত নহে। ফিরিঙ্গিদের সম্পর্কে তাঁহার সাবধান বাণী—

জানিহ নিশ্চিত—
রাজ্যলিপ্সা প্রবল সবার।
দাক্ষিণাত্যে বুঝহ ব্যাভার,
ছলে বলে বিস্তার করিছে অধিকার।

অমাত্যদের মনোভাবও তাঁহার বুদ্ধিকে ফাঁকি দিয়া এড়াইতে পারে নাই—"কুটীলতা কুটিল না করিবে বর্জন" তাহা তিনি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছেন এবং খুব স্পষ্টভাবেই বুঝিয়াছেন—"রাজ্যে গোলযোগ স্বার্থী হ'লেই তাদের মঙ্গল।"

সিরাজের দৃষ্টিতে সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার পরিমণ্ডলটিও অস্পষ্ট নহে—ভারতবাসী ভারতবাসীর যুদ্ধে ক্লান্ত!...ভারত বিচ্ছিন্ন। ভারত সন্তান পরস্পরের শত্রু। ইহাও সিরাজের মতে 'এই বাহ্য'। সিরাজ যেখানে প্রজার মঙ্গলের মুখ চাহিয়া বার বার ফিরিঙ্গিদিগকে মার্জনা করিয়াছেন (১ম অং) সেখানে আমরা...সিরাজেরই ঘোষণায়—"প্রজার মঙ্গল কার্য্য সতত সাধন, উদ্দেশ্য জীবনে।" যে প্রজাবৎসল সিরাজের রূপ ফুটিয়াছে তাঁহাকেই দেখি, বটে, কিন্তু যে সিরাজ বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষায় ঐকান্তিক যে সিরাজের চোখে বাঙলা মাতৃভূমি, বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের আসল পরিচয় বাঙালী, হিন্দু-মুসলমান

"এক স্বার্থে বাঙলায় আবদ্ধ," বাঙলার গৌরব বাঙলার স্বাধীনতা···স্বদেশের গৌরব রক্ষা যে সিরাজের কাছে নিজের স্বার্থ ও প্রাণ অপেক্ষাও কাম্য, বিদেশী দস্যুর হস্ত হ'তে প্রজা রক্ষা করার জন্য যে সিরাজ সঙ্কল্পিত এবং সঙ্কল্পিত বলিয়াই ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষে অগ্নির্বাণ আগ্নেয় উদ্গার—সেই স্বদেশপ্রাণ নবজাতি-চেতনায়-উদ্বুদ্ধ, ইংরাজ বিদ্বেষী সিরাজ সিরাজের আসল ভাব-বিগ্রহ। এই সিরাজ যেন স্বাধীনতাকামনায় বাঙলার স্বাধীনতা-রক্ষা-সংগ্রামের বাঙলার মর্মেরই বাণীমূর্ত্তি। সিরাজ ইংরেজ-বিদ্বেষের একটি অগ্নিশিখা। "ফিরিঙ্গি বাঙলার দুশমন" (১ম দৃশ্য) "কিন্তু সাবধান নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে পদ-অগ্রস্থান" (ঐ) শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার। বিদেশী ফিরিঙ্গি বন্ধু নহে; আপনার··· চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার" (ঐ) প্রভৃতি উক্তির মধ্যে মনোভাবের আগুন যেন বাক্-শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই অনলের মূলে রহিয়াছে·· স্বদেশ প্রাণতা·· ঐকান্তিক স্বাধীনতা-কামনা—ব্যক্তি-স্বার্থ-নিরপেক্ষ স্বদেশ-প্রীতি। বাঙলার কল্যাণ সাধন করিতে তিনি বাঙলার সন্তান—হিন্দু-মুসলমানকে আহ্বান করিয়াছেন···কারণ হিন্দু-মুসলমানের বংশধরগণ যেন "নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর"। এই মনোভাবেরই একটি তির্যক প্রকাশ—"যে হিন্দু-মুসলমান স্বার্থ-চালিত হ'য়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করবে সে কুলাঙ্গার। মাতৃভূমির কলঙ্ক। তার জীবন ঘৃণিত !!"

সিরাজের আক্ষেপ—"যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়·· যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়—এই দুর্দ্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব, নচেৎ অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য্য।"···একাধারে ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ ও স্বদেশ প্রীতিই ব্যক্ত করে। সিরাজের এই স্বদেশ প্রীতি নিছক ব্যক্তি-গত স্বার্থ-প্রেরিত নহে। সকলের উপরে সিরাজের কাছে দেশের স্বার্থ। প্রথম হইতেই সিরাজের মুখে আমরা শুনি—'যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন, পূর্ণিয়ার নবাবজাদের সঙ্গে যোগদান করুন কিংবা

বিদ্রোহীর ধ্বজা উড্ডীন করে যোগ্যজনকে সিংহাসন প্রদান করুন। (১ম—৪র্থ) এই অঙ্কেরই শেষ দৃশ্যে সিরাজকে একই ধরণের কথা বলিতে শোনা যায়—'মহাশয় আপনাদের সকলের যদি অভিপ্রেত হয়, যে আমি অযোগ্য, যোগ্য-ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করে বাঙ্গলার গদীতে স্থাপন করুন'। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে এই মনোভাবটি আরো তীব্র আবেগে ব্যক্ত হইয়াছে—বাঙ্গলার মর্য্যাদা বাঙ্গলার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য…রাজ্য ত্যাগেও সিরাজ কুণ্ঠিত নহেন—সমস্ত সৈন্যের সম্মুখে মীরজাফরকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিতেও সিরাজ প্রস্তুত। সিরাজ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে—"আমি বার বার আপনাদের বলেছি, আমার যদি অযোগ্য বিবেচনা করেন, আমায় রাজ্যচ্যুত ক'রে যোগ্য ব্যক্তিকে রাজ্যপ্রদান করুন"।

এই আদর্শ পরায়ণতাই সিরাজকে "a force symbolized in a man" -এর মর্য্যাদা দিয়াছে। অতীত নৈতিক ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্বেও সিরাজের শীর্ষে একটা মহত্বের জ্যোতির্মণ্ডল বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

সিরাজদ্দৌল্লার চরিত্র সম্পর্কে প্রথমেই এই কথাটি উল্লেখযোগ্য যে নাট্যকার সিরাজের কোন দোষকেই যেমন ঢাকিয়া রাখেন নাই তেমনি কোন গুণকেও চাপিয়া যান নাই বরং দু'একটি গুণ আরোপ করিয়া চরিত্রটির ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ কথা সত্য বটে যে সিরাজ সামন্ততান্ত্রিক যুগের একজন প্রভু…বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সুতরাং এতখানি নবজাতীয়তাবাদের চেতনা তখন বাস্তবিক ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, বাঙ্গলাই সিরাজের রাজধানী বলিয়া, বাঙ্গলাতেই ইংরেজ শক্তির সহিত নবাব-শক্তির দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছে বলিয়া এবং বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের স্বাধীনতা-পরাধীনতার তথা জীবন-মরণের সমস্যাই অগ্রাধিকার পাওয়ায়, খুব স্বাভাবিকভাবেই সিরাজ প্রধানত বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর প্রতিনিধি হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গলাকে 'মাতৃভূমি'…'জন্মভূমি' প্রভৃতি বলায় সিরাজের জাতীয়তা-চেতনা বাঙ্গলার ভৌগলিক সীমায় পরিচ্ছিন্ন

হইয়া পড়িয়াছে। তবে নাট্যকার সিরাজকে বাঙলা-প্রাণ করিয়া সৃষ্টি করিলেও এবং হিন্দু-মুসলমানগণ এক স্বার্থে বাঙলায় আবদ্ধ'—এইরূপ নব্যজাতীয়তাবাদী উক্তি সিরাজের মুখে দিলেও, সিরাজের মুসলমান-চেতনা অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছেন অর্থাৎ সিরাজকে ঐতিহাসিক বাস্তবিকতার গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়াই যথাসাধ্য আদর্শায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান এক স্বার্থে আবদ্ধ—এ কথা সিরাজ স্বীকার করিয়াছেন, "মোহনলালকে সিংহাসন প্রদান করুন"—এ কথাতেও অস্পষ্টভাবে সিরাজের অসাম্প্রদায়িক চেতনাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, কিন্তু…

নাট্যকার চতুর্থ অঙ্কে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সিরাজের মুখে 'মুসলমানের প্রভাব অপ্রতিহত থাকুক'…"আমার রাজ্যত্যাগে যদি মুসলমানের রাজ্য রক্ষিত হয়" "…প্রভৃতি উক্তি বসাইয়া সিরাজের মুসলমান-ব্যক্তিকে তথা ঐতিহাসিক সত্য-কেই রক্ষা করিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলার সময়ে নব্যজাতীয়তার চেতনা যেমন লক্ষণীয়ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, ইহা ঐতিহাসিক-সত্য। সুতরাং নবাব সিরাজদ্দৌলার মধ্যে বিশুদ্ধ নব্যজাতীয়তাবাদ না দেখাইয়া নাট্যকার সিরাজকে যুগোপযোগী তথা বাস্তবিক করিয়াই তুলিয়াছেন। বাস্তবিক সামন্ততান্ত্রিক যুগের সিরাজকে সাম্প্রদায়িক চেতনা শূন্য করিয়া তুলিলে আদর্শায়িতের অভিযোগই যে ঘটিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিরাজের ব্যক্তিত্ব (personality) যে আদর্শপরায়ণতার (principle) মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায় নাই… ইহা প্রশংসার কথা।

কিন্তু, এঙ্গেলস মিস্ কৌটস্কির কাছে-লিখিত পত্রে যে কথাটি বলিয়াছেন, সেই—It is always bad for an author to be infatuated with his his hero...." কথাটি এখানেও বলা যাইতে পারে। সিরাজদ্দৌলার স্রষ্টা অনেকক্ষেত্রেই ভুলিয়া গিয়াছেন "The more the author's views are concealed the better for the work of art" [এঙ্গেলস :—মীনা কোটস্কির কাছে লিখিত পত্র ১৮৮৫] প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সিরাজের চরিত্র আলোচন মারফৎ প্রচার-প্রবণতা দেখা দিয়াছে। এই প্রকট প্রচার-ধর্মিতাকে

দোষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ—এঙ্গেলসের সহিত সকল সাহিত্য-সমালোচকই এ কথা স্বীকার করিবেন—"the bias should flow by itself from the situation and action, without particular indications and that the writer is not obliged to obtrude on the reader the future historical solutions of the social conflicts pictured." সিরাজ এমন সব কথা নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যাহা একেবারে না বলিলেই—ভাল হইত।

এই প্রচার-প্রবণতার বশেই সিরাজ দুইএকস্থলে অত্যুচিতমাত্রায় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে (২য় অঙ্ক ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য)। ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি বা ভবিষ্যদ্-বাণী মাত্রেই নিন্দনীয় এ কথা না বলিয়াও বলা চলে, চরিত্রটিতে মাঝে মাঝে প্রচার-প্রবণতা চোখে-লাগার মাত্রায় পৌঁছিয়াছে। চরিত্রটি সম্বন্ধে সর্বশেষ কথা এই যে চরিত্রে দ্বন্দ্বের তীব্রতা এবং অনুভূতির গভীরতা প্রকাশ করিবার যে সমস্ত অবকাশ পাওয়া গিয়াছে, নাট্যকার তাহাদের সবগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সিরাজের নিজ বিশ্বাস ও বিচারের তথা খেয়ালের সহিত আলিবর্দী বেগমের উপদেশ-নির্দেশের দ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট আকার লাভ করে নাই। অধিকন্তু চরিত্রটিকে যে উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন করিয়া শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই সঙ্কটের বিরুদ্ধে সিরাজের দ্বন্দ্বটিকে আরো সচেতন ও স্ফুটতর করার সুযোগ রহিয়াছে। নাট্যকার সেই সুযোগকে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সিরাজ-চরিত্রটি ধারণা (concept) হিসাবে যত প্রশংসনীয় হইয়াছে, রূপায়ণের (execution) দিক দিয়া তত সার্থক হইতে পারে নাই।

করিমচাচা

সিরাজদ্দৌলার পরেই উল্লেখযোগ্য চরিত্র—করিম চাচা। করিম চাচার সংক্ষিপ্ত পরিচয়—রাজবল্লভের ভৎসনায় প্রকাশ পাইয়াছে—"করিম চাচা, তুমি আমার অন্নে পালিত; তোমার সহিত আমার দূর সম্পর্ক মাত্র। আমার অনুরোধে আমির-ওমরাও সকলে

তোমাকে ভালবাসে। তোমার কামিনীকান্ত নামের পরিবর্তে আদর ক'রে "করিমচাচা" বলে তাকে দেখছি তুমি নবাবের নিকট ফাঁকামি করে তার প্রিয় হয়েছ, সেই নিমিত্ত গর্বে যথারীতি সকলকে সম্মান করো না। তোমার সকল কথায় কথা কওয়া ভাল নয়।" অর্থাৎ—করিমচাচা, আদরের ডাক নাম। আসল নাম কামিনীকান্ত (কমলাকান্তের নিকট আত্মীয় নয় তো?) রাজদুর্লভের দূর সম্পর্ক এবং অন্নে পালিত। গুণের মধ্যে ফাঁকামি এবং সেই গুণেই এইরূপ দশজনের প্রশ্রয় পাওয়ার ফলে (এই ধরণের রসিক চরিত্র সব দেশে এবং প্রায় সব যুগেই প্রশ্রয়—ইংরাজীতে বলা যায় লাইসেন্স পাইয়া আসিয়াছে) করিমের বড় দোষ দাঁড়াইয়া গিয়াছে—করিম সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করে না এবং সকল কথায় কথা কথা বলিতে চেষ্টা করে। ছোটখাট দোষও অবশ্য আছে—করিম নেশাখোর—চণ্ডু-আফিঙ্-মদ সবই চলে এবং জীবনের বড় আকাঙ্খা মাত্র "দুটান চণ্ডু আর দু'পেয়ালা মদ"-এর চাহিদায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে এইটুকু করিমের একান্তই বাহিরের পরিচয়।

আসলে, করিম চাচাকে আমরা inverted serious' বলিয়া গণ্য করিতে পারি। করিমের ফাঁড়ামির অন্তরালে একজন দূরদর্শী স্বদেশবৎসল ও মহানুভব ব্যক্তি বিরাজ করিতেছে। তাহাকে লইয়া সকলে রসিকতাই করুক আর যাহাই করুক, করিমের দৃষ্টিতে রঞ্জন-রশ্মির সমীক্ষণ-শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডু-আফিঙ-মদ তাহার চর্মচক্ষুর উপর যে প্রভাবই বিস্তার করুক, মর্মচক্ষুকে যেন আরো প্রসারিত ও দূরদর্শী করিয়া তুলিয়াছে। বোধ হয় কমলাকান্তের মত যতই সে নেশা করে ততই তাহার চোখ খুলিয়া যায়—তাহার দৃষ্টি—ব্যক্তি-চরিত্র, জাতি-চরিত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব কিছুরই স্বরূপ যেন সমগ্র রূপেই প্রত্যক্ষ করে। বাস্তবিক করিমচাচা অতি সূক্ষ্মগ্রাহী বুদ্ধির অধিকারী।

কিন্তু করিম চাচা শুধু দ্রষ্টাই নহে—সঙ্গতঃ একজন বক্রোক্তি-নিপুণ ভাষ্যকার। তাহার এক একটি টিপ্পনী কাহারও কাহারও পক্ষে রীতিমত অস্বস্তি

টিপুনি এবং সকলের পক্ষেই অমৃত-শলাকা। ব্যক্তির অন্তরের অসন্তোষের উৎক্ষেপটি, জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি···সব কিছুই তাহার ব্যঙ্গোক্তির ও বক্রোক্তির এক একটি চমকে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িয়াছে। করিম চাচার এই বক্রোক্তিপরায়ণতা, আপাতদৃষ্টিতে নিছক বাক্-চাপল্য বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু আসলে এই বক্রোক্তি-পরায়ণতার মূল রহিয়াছে গভীর এক আন্তরিকতার ক্ষেত্রে—করিম চাচা যে পরিমাণে বাংলাকে ও বাংলার স্বাধীনতাকে ভালবাসে, সেই পরিমাণেই সে ভালবাসে বাংলার নবাবকে এবং সেই পরিমাণেই সে ফিরিঙ্গিদিগের প্রতি বিরূপ। করিম চাচার নবাব-প্রীতি ও ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ আসলে আন্তরিক বাঙালী প্রীতি ও স্বাধীনতা প্রীতিরই পরিণতি বিশেষ। নেশাখোর করিম চাচা যে অতি লঘু কথা বলিতে বলিতে গুরুতর কাজ করিতে পারে,—সিরাজের পোষাক পরিয়া সিরাজের পলায়নকে সহজসাধ্য করিবার জন্য সে যে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতেই তাহার অন্তরের অন্তস্থলের পরিচয় উৎকীর্ণ হইয়াছে।—তাহার শেষের ব্যথিত প্রশ্ন—বাংলাটা কেন আমাদের ?"

করিম চাচার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আগে শেক্স্‌পীয়রের "চতুর্থ হেনরী" (১ম ভাগ) নাটকের "ফলস্টাফ" চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচকেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। ফলস্টাফের witty "prose-poetry" সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"it may suggest a kind of commentary on the world of the play and thus indicate the positive function which the character of Falstaff has in the play; it may help us see more clearly what is the attitude of Shakespeare toward the characters and events of the play and the attitude toward them which he expects us as readers to adopt—(Understanding Drama) অর্থাৎ ফলস্টাফের উক্তিগুলি নাটকের ঘটনাবিন্যাসের ভাষ্য এবং ঐ ভাষ্য রচনাতেই চরিত্রটির প্রধান উপযোগিতা। ঐ ভাষ্য হইতেই বুঝা যায় নাটকের চরিত্রগুলি

এবং ঘটনাসমূহের কোনটার প্রতি শেক্সপীয়রের কি মনোভাব এবং নাট্যকার পাঠকদের কাছেও মনোভাব প্রত্যাশা করেন। করিম চাচার উপযোগিতা বিচার করিবার সময় ফলষ্টাফ সম্পর্কিত উল্লিখিত মন্তব্যটি মনে রাখা খুবই বাঞ্ছনীয়। ফলষ্টাফ ও করিম চাচা এক হিসাবে অবান্তর বটে, কিন্তু অন্যহিসাবে অপরিহার্য্য।

করিম চাচা নাটকখানির সার্ব্বভৌম ভাষ্যকার। নাটকের চরিত্র ও ঘটনার আলো করিমচাচার মনো-ভঙ্গীর আতস কাচে প্রতিফলিত হইয়া স্বরূপত বিচ্ছুরিত হইয়াছে। করিমচাচার বক্রোক্তি বা ব্যাজস্তুতি, সর্ব্বদাই সিরাজ চরিত্রের মহত্ত্বের বা প্রশংসনীয় দিকটিকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং সিরাজের বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সিরাজবিরোধী কার্য্যকলাপের দোষের দিকটিকে বড় করিয়া দেখাইয়াছে আর সিরাজের পাপাচার অস্বীকার না করিয়াও, আচরণের সূক্ষ্ম প্রেরণাকে বিশ্লেষণ করিয়া আচরণের অনিবার্য্যতা প্রমাণ করিয়া সিরাজের দোষের ভারকে লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছে। করিমচাচার দৃষ্টির সবাক লণ্ঠনের আলোতেই আমরা চরিত্র ও ঘটনার স্বরূপটি দেখিতে পাই।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে :—করিম প্রথম প্রবেশ করে এবং কৃষ্ণদাসকে ক্ষমা করায় সিরাজ চরিত্রের যে ঔদার্য্য প্রকাশ পায় সেই ঔদার্য্যের প্রতি বক্রভাবে (কৃষ্ণদাসেরও বড় অপমান হল) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাবী ঘটনা বা ষড়যন্ত্রকারীদের মনোভাবটিও প্রকাশ করিয়া দেয়—(এখন গিয়ে সকলকে ঘাড়ে চাপো—আর তো উপায় দেখছিনে) তাহার মুখে ব্যাজস্তুতিও শোনা যায়—"বেকুব নবাব, নবাবীই জানে না, কারুর গর্দ্দানা নেবার হুকুম দেয় না—ওকে আগে তক্তা থেকে নাবাও। এমন একজন নবাবের বেটা নবাবকে বসাও, যে হক বলতে জুতো তথা লাথি মারে, যে কয়েদ করে টাকা আদায় করে। টাকা ভাঙলে মাপ, শত্রুতা করলে মাপ—এ ব্যাটা কি নবাব, ছ্যাঃ।"

দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—করিম প্রথমে উমিচাঁদের গোপনক্রিয়া-কলাপকে একেবারে যে অনাবৃত করিয়া দেয় (শহরটার যখন ইংরেজ কোম্পানি থাকিল, তখন নবাব হ'য়ে তাদের সামগ্রী বেচে লাভ করছে…) তারপর—

সমস্ত উক্তিটি—"এলো মেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই।"…এক চমকে অমাত্যবর্গের অভিসন্ধিকে ব্যক্ত করিয়া দেয়।

অমাত্যবর্গ, এক দিক দিয়া দেশের বিশৃঙ্খলাই কামনা করে…রাজ্যে সুশৃঙ্খলা থাকিলে প্রজাপীড়নের সুবিধা একটু কম হয় বলিয়া ওলট-পালটই তাহাদের কাম্য কারণ প্রজা যত বেওয়ারিশ [redacted] তত প্রজা পীড়ন করিয়া ধন লুণ্ঠন করার সুবিধা হয়।—অমাত্যদের প্রজা-শোষণের এই গোপন অভিসন্ধি করিম বেফাস করিয়া দেয়…বলে…"একটা ওলট-পালট না হ'লে, আমার সুবিধা কিসে কয় বলুন? বেওয়ারিশ প্রজা বানিয়ে মজা করি কিসে বলুন? অমাত্যবর্গের রাজনীতি যে অর্থনীতির মূল হইতেই জন্মিয়াছে করিম তাহা ভালভাবেই বুঝে…সকলকেও বুঝায় তথা আর্থ-রাজনৈতিক (econo-political) অবস্থাটিকে বাস্তবিকভাবেই রূপ দিতে চেষ্টা করে। এখানেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী-জাতির সাধারণ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও করিম প্রকাশ করে—আমার কি বাঙলা দেশে জন্ম নয়, আমি কি মতলববাজ নই, আমি কি আপনি পাঁচ দিতে জানি নি?……বাঙলায় জন্মেছি আমার—আপনার ভালোই ভালো।" করিম মঞ্চ থেকেই বলে—"এ বাঙলায় যিনি শান্তি স্থাপন করবেন তিনি বিধাতা পুরুষ। বাঙলা ফিরে গড়তে হবে, পুরানো বাঙলায় চলবে না" (নাট্যকারের দৃষ্টি যথার্থই দিব্য।) অবশ্য করিম কেবল বাঙলার দোষের দিকটাই দেখাইয়াছেন তাহা নহে, অনৈক্যের দুঃখে করিম অতি-আক্ষেপেই বলে।—"এই বাঙলায় যদি তিন জনের একমত দেখাতে পারেন, তা'হলে নাকে খৎ দিবে, আফিঙ্‌ ছেড়ে দেবো; তবে…ইহাও বলে—"বাঙলার বুদ্ধিও যেমন প্রখর, প্যাঁচও তেমনি মুড়ি মুড়ি। দ্বিতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে—করিম সাধারণ ভাবে মনুষ্য-চরিত্রের ছদ্মবেশের প্রতি এবং বিশেষভাবে নবাবী ফৌজের পাহারাওয়ালাদিগের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছে। "সমুদ্রের গর্ভে নজর যাবে, কিন্তু মানুষের পেটের মধ্যে সেঁধোনো তোমাদের কর্ম নয়। বড় জবর মাটির জ্যান, বুকেছ বাবা।"—চিরকালের

সত্য কথা। কবিৎ সিরাজের অবস্থাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে—যে ব্যাটার তিন কুলে কেউ নেই, সেই তো বাঙলার নবাব।—এই একটি মাত্র কথায়। কবিৎ বুঝাইয়া দেয়—নবাবটা কোথায় তা একবার কেউ খোঁজ নিলে না!

তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্কে: ফরাসী ও ইংরেজ এই দুই জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কবিৎ তাহার স্বভাব-সিদ্ধ বক্রোক্তি-দ্বারা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। ফরাসীরা ইংরেজকে 'পড়সি', 'এক ধর্মের লোক' বলিয়া সহযোগিতা দেখায় বটে কিন্তু ইংরেজদের স্বভাব উল্‌টো। ঘুঁশালাকে কবিৎ যাহা বলে ইংরেজের চরিত্রকে এক কথায় বলিতে গেলে ঠিক তাহাই বলিতে হয়—"এক হাত গলায় আর এক হাত পায়ে দেওয়া" ইংরেজরা ছাড়া কোন জাতি পারে না। ঘুসলার কথাই ষোল আনা সত্য—"ইংরাজ চরিত্র সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন'— এক কবিৎ ছাড়া, নবাবী কার্যে তাহার মত দুই চারি 'আদমি' থাকিলে— "আলিনগরের সন্ধি হইত না, ইংরাজ কলিকাতায় থাকিত না।" ঘুশালাকে বলার সবেই ইংরেজের গাঁটচোরা চালটিকে চোখে আঙুল দিয়া কবিৎ দেখায়—"তা হ'লে ব'লতে—'এই আমাদের ফৌজ এলো বলে, এই আমরা কোলকাতা উড়িয়ে দেব। নবাবী আমলাদের টাকা দিয়ে—ঘুষি, কড়ক দিয়ে কড়ক কর্‌লে হাত করছে, নবাবকেও একটু আধটু শাসাচ্ছে'। কবিৎ শুধু ফরাসী ও ইংরেজদিগের—আচরণের উপর টিপ্পনি করিয়াই ক্ষান্ত [illegible] না—সিরাজের উপর ও আলোক প্রক্ষেপ করে—"নবাব মদ ছেড়ে খালি ভাবছেন এ করি কি ও করি। এই ঘুঁসোকোর পা দিয়েই প্যাঁচ পড়েছে।" এত বিবেচনা না করিয়া হুকুম ঝাড়িলেই…"সব দাঁতে ভাঙ্গা কেউটে গর্তে সেঁধোতো"।—"শত্রু যত বাড়ছে, নবাবও তত কসুখবু হয়ে বিবেচনা করছেন।" কবিৎ সিরাজের ভাবী পরিস্থিতিটিও ইঙ্গিতে স্পষ্ট জানাইয়া দেয়। "আর মাতামহীর অনুরোধ রক্ষা করব না" বলিয়া সিরাজ সদর্প করিবার পরেই কবিৎ—জানায়—"ঐ যে বেগম মহিষী আসছেন। বুঝি নবাবকে মীরজাফরের হাতে হাতে সপ্‌বেন। আহা আমলারা যে চলে

গেল তা' হ'লো একে একে সকলের হাতে হাতে সপ্‌কেন"। তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—করিম চাচা সিরাজের নিরুপায় অবস্থাটির কথাও জানায়—"এ ঘোড়া পায়ে ধরলেও পাজী, আর কত্তা হ'লে তো পাজীর পাজী।" এখানেই করিমচাচা হোসেনকুলি-বধের, ঘসেটি-হত্যার পক্ষে চাপাই গায়। হোসেনকুলি-বধ নিষ্ঠুর কার্য্য সন্দেহ নাই কিন্তু হোসেনের আচরণ যে অসহ্য তাহাও মনে করা দরকার—'অন্দরে ঢুকে খাঁ-বাদীর সঙ্গে পিরে বসবেন' ইহা বরদাস্ত করিতে না পারিলে দোষ দেওয়া যায় না। ঘসেটির নিষ্ঠুর হত্যা আমাদের প্রাণে আঘাত দিতে পারে কিন্তু করিম চাচার শ্লেষের খোচাটি—"দেখছি তুমি চাচীর পার্শে আর একজন চাচাকে বসিয়ে সোনায় দিতে পারো"—ঘসেটি হত্যার অভিযোগের গুরুত্ব বেশ খানিকটা লঘু করিয়া দেয় তথা সিরাজের দিকটি ভাবিয়া দেখিতে বাধ্য করে। অধিকন্তু করিমচাচা স্বার্থ সন্ধানীদের—সতর্ক করে "যে যার স্বার্থ তো চেঁকে আছো। আখেরে কতটা টেকবে তা একবার ভাবছ কি? ইংরেজের আসল উদ্দেশ্য কি তাহা চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দেয়।......"সাদা চেহারা চেন না, শেষ পস্তাবে, ওরা খুব দাওবাজ, ওদের কাছে কারো দাও চলবে না।" করিম ভবিষ্যদ্‌ দ্রষ্টার মত বলে—"ইংরেজের কোর্টের ল্যাজ্‌ ধরলে একূল ওকূল দু'কূল যাবে। দুধ কলা দিয়ে কাল সাপের ঝাঁক পুষো না। সিরাজের পক্ষে করিম জোরালো ওকালতি করে—প্রমাণ করে "হিন্দুর সুবিধা মত নবাব তো এ নবাব নাটোর মত কেউ হয়নি" "সব বড় বড় কাজ হিন্দুর" এবং সিরাজ সম্পর্কে অমাত্যবর্গের যে আতঙ্ক তাহার জন্য দায়ী "নবাবের দোষ" নহে—অমাত্যদের 'মনের দোষ'; করিম ইংরেজ-অধীন বাঙালীর ভবিষ্যৎ যেন প্রত্যক্ষ করে—"জুতো টুপো যাওয়া? চাই বই কি। অন্নাভাবে মরা?—দুইটি প্রশ্নে বাঙলার ভাবী রাজনৈতিক মর্য্যাদা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রতিফলিত। চতুর্থ অঙ্কে—চতুর্থ দৃশ্যে:—করিম বক্তৃতা ও আপাত-লঘুতা রক্ষা করিয়াই, গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়—বাঙলার নবাবকে

—সিরাজকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়। সিরাজের সহিত বেশ বিনিময় করে। হাসি যে কান্নারই একটা রূপ হইয়া ফুটিতে পারে এখানেকার করিমচাচাকে না দেখিলে বুঝা যায় না—"এই দুঃসময়ে বকশিস নিতে এসেছি, আর কখন তো পিত্যেস রইল না"—কান্নারই অন্য একটি রূপ। এখানেই জাতির প্রতি বিদ্রূপ ও অভিমান শ্লেষ হইয়া বাহির হয়। "জুতো জোড়াটার মর্য্যাদা বুঝলুম না"—রীতিমত একটি জুতোর আঘাত। শুধু আঘাত যাহার গায়ে না লাগিবে তাহার জন্য স্থূল আঘাতের বন্দোবস্ত আছে—"ইংরেজের বুট পায়ে জুতো খেয়েও জুতোর মর্য্যাদা শিখ্‌লে না। অনেক বাঙ্গালী আমাকেই বুটের মর্য্যাদাটা ঠেকে শিখতে হবে"...করিম রাজভক্ত অথচ বাঙ্গালী জাতিকে নেমক হারামির জন্য শেষ ধিক্কার দেয়—"নেমকহারাম চাচা, কি করবো মাটির দোষ। আমিও তো বাবা বাঙ্গালী। দেখ্‌ছি বাবা সাত পুরুষের নেমক উপরে তুলে ফেলছে। আমি না হয় অকৃতজ্ঞ!"—অতি সত্য কথা; করিম চাচা—'Commentary on the world of the drama"—নাটকখানির চরিত্রের ও ঘটনার মহাভাষ্যকার।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি কাল্পনিক চরিত্রের কথা মনে আসে। চরিত্রটি সিরাজের প্রতিপক্ষীয়—নারী-চরিত্র জহরা। জহরা নিজের নামটির তাৎপর্য্য নিজেই শুনাইয়াছে—"প্রতিহিংসা হৃদয়ে জর্জ্জরীভূত হ'য়ে জহরা নাম গ্রহণ ক'রেছিলাম।" জহরা পতিপরায়ণা রমণী'রই 'প্রতিহিংসায়-অন্ধ' "প্রেতিনী পিশাচিনী, নরক-সহচরী—মূর্ত্তি। জহরা করিমের কাছে নিজের দুই সত্তার পরিচয় (অশোভনভাবে) ব্যাখ্যা করিয়াছে—"সে জহর নবাব শোণিতে ধুয়ে গিয়েছে, এখন আমি পতিপরায়ণা রমণী"। জহরা হোসেন কুলিখাঁর স্ত্রী—অদ্ভুত এক পতিপরায়ণা রমণী। আমিনা বেগমের মত সকলের মনেই এ প্রশ্ন জাগে—কি ভীষণ মেয়েমানুষ! হোসেন তো বলেছি আর আমিনা বেগমকে নিয়েই ছিলো, এর প্রতি তো ফিরেও চাইতো না"। জহরার অবস্থাটি জহরা নিজেই স্বয়ং, ব্যক্ত করিয়াছে—"হোসেন তুমি আমার স্বামী। তার অদ্ভুত প্রেতাত্মা

আমার সঙ্গে দিবারাত্র ভ্রমণ ক'চ্ছে—তার উত্তেজনায় আমি এক মুহূর্ত স্থির নই……শোণিত-তৃষ্ণার হা হা রবে সে আমার আহার নিদ্রা হরণ করেছে" ঘসেটি ঠিকই দেখিয়াছে—প্রতিহিংসার আগুন ওর চক্ষে·· সিরাজের শোণিত-তৃষ্ণায় ওর জিহ্বা শুষ্ক। "নারী প্রতিহিংসাপরায়ণা হইলে, কত ভীষণ হইতে পারে জহরা তাহারই দৃষ্টান্ত। ঘসেটি বোধ হয় এই প্রতিহিংসার উগ্ররূপ দেখিয়াই বলিয়াছে "নারী, নারীরই তো প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা আর কার?"

প্রতিহিংসা-পরায়ণতা জহরাতে অতি উৎকট মাত্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। শুধু যে নাটকীয় শয়তানী শক্তিতেই তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ তাহা নহে, সে সর্ব্বত্রগামিনী, বহুবেশধারিণী—'দেশ-কাল-পাত্র'—কোনকিছুরই দ্বারা তাহার গতি-বিধি বাধিত হয় না। সিরাজের প্রশ্নের উত্তরে জহরা বেশ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে—"আমি সর্ব্বত্রে থাকি, আমি এক মুহূর্ত স্থির নই। বায়ু যেমন উত্তপ্ত হয়ে ঘূর্ণায়মান হয় আমিও তেমনি অন্তর-তাপে দিবা-রাত্র ঘূর্ণায়মানা।" এই সর্ব্বত্রগামিতা মুর্শিদাবাদে এবং দেশীয় শিবিরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, পলাশী, ভগবানগোলা, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম [illegible] গৃহ, গড়ের মাঠ সবই তাহার পায়ের তলায়।

জহরা ছদ্মবেশে যে ঘসেটি-বেগমের অর্থ সরাইয়া লয়—সেই অর্থ ব্যয় করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করে—ইংরাজ-সৈন্যকে অর্থ দেয়—প্রজাপুঞ্জকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করে এবং সিরাজ-বিদ্বেষী করিয়া তোলে। ঘসেটি-বেগমের দ্বারা সিরাজের মোহর চুরি করাইয়া সে সিরাজের নামে মিথ্যা পত্র লিখিয়া লিখিয়া সিরাজের বিরুদ্ধে সমগ্র প্রজা শক্তিকে উত্তেজিত করিতে—প্রতি হৃদয়ে সন্ত্রাস আশঙ্কিত করিতে—চেষ্টা করে। নিশা-যুদ্ধে সে ইংরাজ-বাহিনীকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়—গোলাগুলি তাহাকে আঘাত করেনা (ক্লাইভের সম্মুখে দম্ভ করিয়াই বলে—"গোলাগুলি! এমন গোলাগুলি তোমাদের সৈন্যের নিকট নাই, নবাব সৈন্যের নিকট নাই, যে আমাকে আঘাত করবে।") যুদ্ধক্ষেত্রে সে নবাব-সৈন্য বিশৃঙ্খল করে। জহরা মিথ্যা বলেনা—আমি

মায়াবীর—শক্তিসম্পন্না, সয়তানকে আত্মবিক্রয় করেছি"। সত্যই হোসেন কুলির যুক্তি তাহাকে 'সয়তানবীর্য্যবল" দিয়াছে।

জহরা শুধু সর্ব্বত্রগামিনী, সর্ব্বকার্য্যসাধিনীই নহে…জহরা প্রায় সবজান্তা। লোক-চরিত্র তথা মনস্তত্ত্ব সে খুব ভালই বোঝে; বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থাটি সে এত সুন্দর ভাবে ক্লাইবকে বুঝাইয়া দেয় (চতুর্থ অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য) যে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—তাহার 'দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত… "বিধিলিপি…সম্পূর্ণ গোচর"। আশ্চর্য্যের কথা—এমন কি ক্লাইবের ধর্ম্মপুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়া সে ক্লাইবকে মীরজাফরের স্বরূপটুকু বুঝাইয়া দেয়। "তবে তোমাদের ধর্ম্মপুস্তকে কি বলে? যদি রাজ্যলোভ দিয়ে, সয়তান মানুষকে বশ করতে না পারে তবে সে সয়তান সয়তান নয়।") [বেওয়ানাই বটে!] বেওয়ানাপনার উৎকৃষ্ট প্রকাশ দেখা যায়—পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ-গর্ভাঙ্কে—যেখানে জহরা বিশ্বাসঘাতক প্রভুদ্রোহী রায়দুর্ল্লভ প্রভৃতিকে জন্মভূমি হিন্দুনাম, মুসলমান-নাম কলঙ্কিত করিবার জন্য—আলীবর্দ্দীর বংশধরের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য, বংশধরকে হত্যা করিবার জন্য এবং পরিবারবর্গকে পথের ভিখারিণী করিবার জন্য তারস্বরে ধিক্কার দিয়াছে। হোসেনের কাছে মার্জ্জনা চাহিয়া "পতন"—এ, জহরার অতিনাটকীয় জীবনের পরিসমাপ্তি।

* [জহরা-চরিত্রটি আগাগোড়া অতি-নাটকীয়; তাহার গতি-বিধি ও কার্য-বিধি সমান চমকপ্রদ! রোমাঞ্চ-রস দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাকে রসিত করিতে যাইয়া নাট্যকার "irrational" এর (অনৌচিত্যের) একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছেন। বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকে রোমাঞ্চপ্রিয় জনসাধারণ জহরাকে যত তৃপ্তির সহিতই আস্বাদন করুক আধুনিক বাস্তবতা-প্রিয় জনসাধারণ জহরাকে লইয়া তেমন তৃপ্তি পাইবে না। জহরাকে লইয়া এত বাড়াবাড়ি করিবার কোন প্রয়োজনও ছিলনা। কবিদের সহিত এক হইয়া প্রত্যেক সমালোচকই বলিবেন—"ভালো ঘোট চাটী, খুব কারখানা দেখালে!

তোমার অতটা না করলেও চলতো। এই রাজা-রাজড়া, আমির ওমরাও আর ঘসেটি বেগম হলেই কাজ রফা হতো!" দেখা যাইতেছে—নাট্যকার খুবই সচেতন—নিজেই নিজের সমালোচনা করিয়াছেন এবং যাহারা মনে করিবে যে একটা কাল্পনিক চরিত্র দিয়া নায়কের ট্র্যাজেডি সংঘটিত করা হইয়াছে তাহাদেরও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। জহরা 'দেশ-কাল-পাত্র' ঔচিত্যের গণ্ডী না ছাড়াইলে…নাটকখানির ঐতিহাসিক বাস্তবতার মাধা-বোধ আরও জমাট হইত। অসাধারণ (abonormal) চরিত্র সৃষ্টির অধিকার নাট্যকারের অবশ্যই আছে, কিন্তু চরিত্রের অস্বাভাবিকতা সকল নাটকেরই পক্ষে বড় দুর্বলতা।

জহরার পরে লক্ষণীয় চরিত্র—মীরমদন ও মোহনলাল। দুইটি চরিত্রই একই মুদ্রার এ পিঠ ও পিঠ; সুতরাং একই বন্ধনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। উভয়েরই এক কথা "প্রতিপালক উচ্চপদদাতা মর্য্যাদাদাতা নবাবের মঙ্গল কামনা একমাত্র আমাদের অভিপ্রায়।" স্বদেশ-প্রীতির একবৃন্তে দুইটি সুরভিত পুষ্প। বাঙলার মঙ্গলের জন্য নবাবের মঙ্গলের জন্য তাহারা ধন প্রাণ দেশ সব-কিছু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। ইংরেজ-আধিপত্যের অমঙ্গল উভয়ের চোখেই সুস্পষ্ট…"জন্মভূমি হতে অর্থোপার্জ্জন ক'রে স্বদেশ প্রেরণ কচ্ছে, রাজার ন্যায় বঙ্গভূমি অধিকার কচ্ছে, বাটা প্রদান না করে টাকা মুদ্রণ কচ্ছে, শুল্ক প্রদান করে না, ইংরাজের যা লাভ সমস্তই বঙ্গবাসীর ক্ষতি"

"নবাব-কার্য্যে দেশের কার্য্যে যদি প্রাণ ত্যাগ করবার সুযোগ হয়, সে সুযোগ আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি"—উভয়েরই ঐকান্তিক ও আন্তরিক কামনা। স্বদেশের কার্য্যে, নবাবকার্য্যে উভয়েই প্রাণ দেন—মীরমদন পলাশী-প্রান্তরে গোলার আঘাতে আর মোহনলাল মীরজাফরের আদেশে ঘাতকের তরবারি-আঘাতে। মোহনলাল-মীরমদন স্বদেশ-প্রেমের প্রদীপ্ত শিখা। মোহনলাল নিজ মুখে না বলিলেও সকলেই স্বীকার করিয়াছেন তিনি "রাজভক্ত স্বদেশভক্ত…'বঙ্গবাসী-হৃদয়ে চির আসন…'ঘাতকের অস্ত্রে

হত হ'লে (আমার) লজ্জা নষ্ট হবে না'। ক্লাইব পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—"you are a brave soldier. সত্যই বলিয়াছেন, মৃত্যুতে আপনার গৌরব খর্ব্ব হইবে না—you are a patriot"। *[তবে মীরমদন মোহনলালের রাজভক্তি বা স্বদেশভক্তি যত প্রশংসনীয়ই হউক, শিল্পিত চরিত্র হিসাবে উঁহাদের ত্রুটি আছে এবং সেই ত্রুটি এই যে—উঁহারা নিজেদের গুণের কথা নিজেরাই খুব বেশী করিয়া বলিয়াছেন। একটু কম মুখর হইলেই তাঁহারা চরিত্র হিসাবে প্রশংসনীয় হইতে পারিতেন।]

মীরমদন-মোহনলালের উলটো দিক—মীরজাফর জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি স্বার্থসর্ব্বস্ব, "বেইমান বিশ্বাসঘাতক কুলাঙ্গার," লজ্জাহীন নীচাশয়ের দল। স্বার্থ সিদ্ধি ছাড়া আর কোন মহৎপ্রবৃত্তি ইহাদের নাই। সকলেই গোপনে গোপনে নিজ স্বার্থ সম্প্রসারণে ব্যস্ত। জহরার মুখে ইহাদের বিবরণ পাওয়া যায়—"বিশ্বাসঘাতী ষড়যন্ত্রকারীরা এক স্বার্থে চালিত নয়...সেনানায়ক বিশ্বাসঘাতক ইয়ারলতিফ ও পত্র লিখেছে—"নবাবী আমায় দাও" মীরজাফরও পত্র লিখেছে—"নবাবী আমায় দাও"; রাজবল্লভ স্বয়ং রাজা হতে চা'ন...রায়দুর্লভ জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপ চাঁদ, মাণিকচাঁদ সকলেরই মনোগত কিসে রাজ্য করগত হবে। রাজ্য করগত করা রাজ্যের মঙ্গলার্থে নয়, দুর্দ্দান্ত নবাবকে দমন করবার জন্য নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়—স্বার্থের জন্য। ...সে স্বার্থ বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের নয়; ব্যক্তিগত স্বার্থ, সেই হীন স্বার্থের আচরণে সকলে অন্ধ হ'য়েছে।"

মোহনলাল মীরজাফর সম্বন্ধে যে মন্তব্যটুকু করিয়াছে—সেই মন্তব্যটি—"যে রাজ্যলোভে মান, মর্য্যাদা, আত্মীয়তা স্বদেশ গৌরব, মুসলমানের গৌরব সামান্য বণিকের পদে অর্পণ করেছে সে যে পিশাচের ক্রীতদাস তা কি অবগত হওনি ?"—উঁহাদের সকলের সম্পর্কেই কম-বেশী প্রযোজ্য। মীরজাফর তো সকলের সেরা—কোরাণ স্পর্শ করিয়া মিথ্যা শপথ করিতেও সে পশ্চাৎপদ

নহে। তবে 'ক্লাইবের গর্দভ' হাতে হাতেই বেইমানিতার ফল ভোগ করিয়াছে—এই যাহা সান্ত্বনা।

এই প্রসঙ্গেই উমিচাঁদকে স্মরণ করা যাউক। **উমিচাঁদ অর্থলোভী** বণিক-শ্রেণীর চিরন্তন আদর্শ। ইহাদের কাছে অর্থই পরমার্থ—আর সব-কিছুই অবান্তর। ইঁহাদের চিরন্তন মন্ত্র—"আমি আর এক কাণা কড়িও ছাড়বো না।" অর্থের জন্য এই শ্রেণীর লোক না করিতে পারে এমন কোন কাজ নাই।...মুনাফার লোভে ইহারা দেশ ধর্ম বিবেক সব-কিছুই বিসর্জন দিতে পারে। [সেঠ সমস্যা **শুধু আজকের সমস্যাই নয়!**] 'বাপ-ছেলে' মরিলেও ইহারা সহিতে পারে কিন্তু টাকা খোয়া গেলে প্রত্যেক উমিচাঁদ বুক চাপড়াইয়া কাঁদে—"ওরে বুক ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল।" টাকা টাকা করিয়াই ইহাদের প্রাণ যায়। উমিচাঁদেও ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

সওকৎজঙ্গ। তারপর এই সকল চরিত্রহীন চরিত্রের দলের মধ্যে **সওকৎজঙ্গের** নামটা কম উল্লেখযোগ্য নহে। সওকৎ জঙ্গ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই অনুবাদ করিয়া বলা চলে,—মূর্খের দাম্ভিকতা উন্মাদের উচ্চাকাঙ্খা, অবাধ্য কামুকতা, বে-লাগাম বাচালামি ও মাতলামি দিয়া সওকতের চরিত্র গঠন। ignorant pride, insane ambition, uncontrollable passions, looseness of tongue and addiction to drink. History of Bengal—Sarkar.) সওকৎজঙ্গের চরিত্র সম্বন্ধে এইটুকুই যথেষ্ট।

এইবার আমরা চরিত্র-বিচারের রায় দিতে অগ্রসর হইতে পারি। প্রথমেই এ কথাটি বলা যাইতে পারে যে নাট্যকার **আদর্শবাদীদের মাত্রা সবক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার পরিধির মধ্যে রাখিতে পারেন নাই**, ফলে প্রচারপ্রবণতা শিল্প—সৌন্দর্য্যকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। [সিরাজ মীরমদন, মোহনলাল, জহুরা] দ্বিতীয়তঃ **কোন কোন** চরিত্রে (জহুরা লুৎফা উৎস

জহরা) অতি-নাটকীয়তার ছাপ খুবই গাঢ়ভাবে পড়িয়াছে। বাস্তবতা অপেক্ষা ভাব-প্রকাশের দিকেই অধিকতর লক্ষ্য থাকায় চরিত্রগুলি ভাবের দিক দিয়া যতটা সংলক্ষ্য হইয়াছে—ঔচিত্যের দিক দিয়া ততটা প্রশংসনীয় [redacted] নাই। কোন কোন চরিত্র [আলিবর্দী-বেগম আমিনা রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, মাণিকচাঁদ,] বেশ বর্ণহীন, কয়েকটি [জহরা, দানশা, করিম ;] বেশী-কম অতিরঞ্জিত, অবশ্য জহরা ছাড়া বাকী তিনটি চরিত্র অতিরঞ্জিত হইলেও আপত্তিকর নহে। বর্ণ-লেপ ব্যাপারে অ-যোগ ও অতিযোগ পরিহার করিতে পারা প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। নাট্যকারে সেই প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মাত্রাজ্ঞান এখানে পাওয়া যায় না।

চরিত্রের উৎকর্ষের পক্ষে বাস্তবিকতা সকল যুগেই অন্যতম অপরিহার্য্য গুণ।—বিশেষতঃ ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের চরিত্রের পক্ষে তো বটেই। পাত্র-পাত্রীগুলি আরো স্থান-কাল-পাত্রোচিত আচরণ করিলে অর্থাৎ ভাবে ভাষায় আরো বাস্তবিক হইলে নাটকখানির গুরুত্ব ও আবেদন আরো যে বৃদ্ধি পাইত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ প্রধান বক্তব্য এই যে প্রধান চরিত্রে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ভাব-গভীর জটিলতা ব্যক্ত হয় নাই। এবং হয় নাই বলিয়া, নাটকখানি 'উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি'তে পরিণত হইতে পারে নাই।

কল্পনা ও ভাবনা

কল্পনা-বৈভব বলিতে আমরা, সাধারণতঃ অর্থাৎ সংকীর্ণ অর্থে, আবেগের বা উপলব্ধির রূপকল্পনাময় কাব্যিকে ভাব-বিস্তারটুকু বুঝিয়া থাকি। ইহাকেই অন্যভাবে—প্রচলিত ভাষায় বলা হয় 'কাব্যিকতা'—(poetic expression)। কিন্তু কল্পনাকে ঠিক এইভাবে সমগ্র রূপটি হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব নহে। কারণ কল্পনাশক্তি অন্তরাত্মার মত দেহের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া বিরাজ করে। চরিত্র, ভাব, ভাষা সব কিছুই কল্পনারই এক একটা খণ্ড অংশ, ঐ সকলের সমবায়েই কল্পনার অখণ্ড রূপ।

ব্যাপক অর্থে কল্পনা, ক্রোচের—"expresion" বা intuition বলা যায়। কাব্যিকতা না থাকিলেও উঁচুদরের কল্পনা-শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে—অতি আধুনিক সামাজিক নাটকাদি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। দৃশ্যকাব্যে (নাটকে) কাব্যিকতার অভাব সত্ত্বেও, তীব্র ও গভীর জীবনের রূপ-পরিকল্পনা অবশ্যই থাকিতে পারে। সিরাজদ্দৌলা নাটকের কথাই ধরা যাউক। সিরাজদ্দৌলা নাটকে—সিরাজদ্দৌলা, করিম চাচা, জহুরা, প্রভৃতি চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে কম কল্পনা-শক্তি প্রকাশ পায় নাই। আর এই সকল চরিত্রের অভিব্যক্তিতে অর্থাৎ ভাবে-ভাষায় ও ভাবনায়, কল্পনা-শক্তির কম কাজ দেখা যায় না। তবে অবশ্যই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে,—রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের পাত্র—পাত্রীর মত, কোন চরিত্র কবিত্বময় ভাষায় ভাবাবেগ ব্যক্ত করে নাই। সেই হিসাবে, বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্রের নাটকে কবিত্বের মাত্রা কম। সিরাজদ্দৌলা নাটকে যেইরূপ কবিত্বের মাত্রা আরো কম—নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে—কবিত্বের অভাবে "literary success" কম হইতে পারে বটে কিন্তু stage success-এ অর্থাৎ ভাল নাটক হওয়ার পক্ষে, কবিত্বের অভাব তেমন কোন বাধা নহে। বিশেষ জীবনের রূপ উপস্থাপিত করা নাটকের উদ্দেশ্য, সেই জীবনটি যদি দর্শকে বস্তুতঃ মূর্ত হইয়া উঠে তাহা হইলেই নাটককে সার্থক সৃষ্টি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ভুলিয়া গেলে চলিবে না—নাটক সাধারণভাবে জীবনের সমালোচনা বটে, কিন্তু বিশেষভাবে জীবনের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ মূর্ত রূপ।

ভাব-পরিধি

সিরাজদ্দৌলা-নাটকের "ভাব-বস্তু" আলোচনা করিবার পূর্বে এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে, ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে গেলে পণ্ডশ্রম হওয়ার দুর্ভাগ্য অনিবার্য। সব নাটকেই একরূপ রস বা ভাব থাকিবে—এ কথা

কোন রসিকই মুখ ফুটিয়া বলিবেন না। সাহিত্য জীবন-সমীক্ষা এ কথা সত্য, এই সমীক্ষা যত গভীর হয়, তত সাহিত্যের মহত্ব বৃদ্ধি পায় সে কথাও সত্য কিন্তু এ কথাও তত সত্য—সব ক্ষেত্রেই সব-কিছু সৃষ্টির অবকাশ থাকে না, আর থাকিলেও খুব বেশী থাকে না। সব নাটকই—বিশেষতঃ ঐতিহাসিক বা সামাজিক সমস্যা-মূলক নাটক, বিশেষ একটি উদ্দেশ্যের অভিমুখী হইয়া গড়িয়া উঠে। এই সকল নাটকে জীবনদর্শন, সমাজদর্শন সব কিছুই প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের বিশেষ উদ্দেশ্যের "ফোকাস" থাকে, ঐতিহাসিক ঘটনা বা সামাজিক সমস্যার উপরে। ঐতিহাসিক বা সামাজিক সমস্যা মূলক নাটকের উদ্দেশ্যকে এই হিসাবে ঠিক একক বলা যায় না; উহা —দ্বৈত, এক লক্ষ্যে—ইতিহাস বা সমস্যা, অন্য লক্ষ্যে—জীবন সমীক্ষা ও রস নিষ্পত্তি; যদিও "হিষ্ট্রি-প্লে" (History play) এবং ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি এবং কমেডির মধ্যে অনেকে সীমা-রেখা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তবু শেষ পর্য্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"The term 'history play is difficult of precise theoretic limitation and in practice, the differentiation of the strict members of this new type frome those plays on historical subjects which follow the more Conservative rules of Comedy and Tragedy. is a task approaching impossibilities."—Tudor Drama—C. F. Tucker Brooke) অর্থাৎ ইতিহাস—নাট্য (History) এবং ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি বা ঐতিহাসিক কমেডির মধ্যে সীমা রেখা টানা অসম্ভব—কারণ "ইতিহাস-নাট্য" যে পরিমাণেই ইতিহাসের নাট্য রূপ হউক—ট্র্যাজেডি রসের বা কমেডি-রসের দুই কেন্দ্র এক দিকে উহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে।

এখন এই কথাটি গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লওয়া দরকার যে ঐতিহাসিক নাটকের ভাব-সত্যের জগৎকে মোটামুটি দুইটি পরিমণ্ডলে ভাগ করিয়া দেখা সম্ভব। একটি ঐতিহাসিক সত্যের—(econo-political

truths) অন্যটি জীবন সত্যের (দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্য)। যে নাটকে দুইটি পরিমণ্ডলই সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয়, সেখানে সোনায় সোহাগা, কিন্তু ঊর্দ্ধতন পরিমণ্ডল না থাকিলেও অর্থাৎ দার্শনিক চিন্তা ভাবনা তেমন না থাকিলেও ঐতিহাসিক সত্যের সম্ভাবেই, ঐতিহাসিক নাটক যথেষ্ট ভাব-গম্ভীর ও মর্যাদাসম্পন্ন হইতে পারে। সিরাজদ্দৌলা-নাটকে গভীর দার্শনিক চেতনা, ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যের অবতারণা একরূপ নাই বলিলেই চলে। [করিম চাচার মুখে—এক স্থলে অদৃষ্ট শক্তির ও আর এক স্থলে—মনুষ্য-চরিত্রের রহস্যের সামান্ত উল্লেখ দেখা যায়। সিরাজের মধ্যে মাত্র একস্থলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং পাপের পরিণাম সম্পর্কে চেতনা দেখা যায়।] ইহার ভাব-সম্পদ, সমকালীন অর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশটির সুষ্ঠু উপস্থাপনার মধ্যে, জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্যে এবং জাতীয়তা (বিশেষ একটা sentiment উদ্বোধনের প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে উল্লিখিত ভাব সত্যগুলি প্রাদেশিক অর্থাৎ ইহাদের সার্ব্বজনীন আবেদন নাই) ইহারা একান্তই বাংলা দেশের বা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাসনা তৃপ্ত করিয়া থাকে। আর একথাও বলা চলে যে—গভীর কোন সাধারণ সমাজ-দর্শন—সমাজ-নীতিগত আদর্শ নাটকের মধ্যে আলোচিত হয় নাই। এই হিসাবে সাধারণ ভাব-সম্পদের দিকে দিয়া নাটকখানি খুব সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই।

তবে বিশেষ বা প্রাদেশিক ভাব-সম্পদের দিক দিয়া নাটকখানি একেবারে নিঃস্ব নহে। **প্রথমতঃ** সিরাজদ্দৌলার সমসাময়িক সামন্ততান্ত্রিক, অর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা নাটকে খুব প্রশংসনীয় মাত্রায় উপস্থাপিত হইয়াছে। **দ্বিতীয়তঃ** বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে দোষ-গুণ নির্মমভাবে বিশ্লেষিত করা হইয়াছে। **তৃতীয়তঃ**—জাতীয়তা স্বদেশপ্রীতির মহিমা উচ্চে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। **চতুর্থতঃ** পরাধীনতাকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে এবং ইংরেজ অধীন ভারতবাসীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনের রূপটিরও ইঙ্গিত

দেওয়া হইয়াছে—(ছুতো নুতো খাওয়া ?…অন্নাভাবে মরা ? (করিম)

পঞ্চমতঃ—হিন্দু-মুসলমানকে একজাতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবার তথা জাতি চেতনার পরিধিকে, ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না করিয়া দেশ শত কুটি গত ঐক্যের সীমা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। **ধর্ম নিরপেক্ষ জাতি গঠনের আদর্শটি নাটকে যথাসম্ভব জোরের সহিত প্রচারিত হইয়াছে।** বাঙলার হিন্দু মুসলমান এক স্বার্থে আবদ্ধ—দেশের পরাধীনতায় উভয়েরই সমান অমঙ্গল এবং হিন্দু মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া উক্ত স্বার্থে চালিত না হইলে—সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় বদ্ধ না হইলে…জাতির অমঙ্গল অনিবার্য—এই ধরণের ভাব সত্য নাটকে প্রচুর পরিমাণেই পরিবেষিত করা হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক জাতি বোধ উদবুদ্ধ করিয়া বৈদেশিক শক্তির (ইংরেজের) কবল হইতে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করিবার প্রেরণা পরোক্ষভাবে সঞ্চার করা হইয়াছে। ফিরিঙ্গি বাঙলার দুষমণ—এই সকল ঘোষণা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করিয়াছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে এত র বিষ গিরিশচন্দ্রের আগে এবং পরেও বটে, আর কোন নাট্যকার এত ভাবে উদ্গীরণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের —ভেদনীতির কূট কৌশলের উপর নাট্যকার গিরিশচন্দ্র উচ্চশক্তির আলোক । করিয়া ইংরেজ-জাতির স্বরূপটি অতি স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া ছেন তথা ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন।

বাস্তবিক—এই সকল ভাব-সত্যের মধ্য দিয়া নাট্যকারের অভিমানসিক মাজনের একটি বিশেষ দিক প্রকাশ পাইয়াছে। দেশের স্বাধীনতা-লনে নাট্যকার তাহার নিজ ক্ষেত্রে থাকিয়াই অর্থাৎ শিল্পের মধ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। জাতির রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খাকে— লমানকে এক জাতি বোধে দীক্ষিত করা, হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ র দ্বারা ফিরিঙ্গি-শক্তিকে (ইংরেজ) পর্যুদস্ত করিয়া স্বাধীনতা উদ্ধার

ও রক্ষা করা এমনি সব আকাঙ্ক্ষাকে—নাট্যকার যথাসম্ভব তীব্র আবেগেই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলাকে বিষয়-বস্তু হিসাবে নির্বাচন করিয়া এবং বিষয়-বস্তুকে যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত করিয়া নাট্যকার খুবই যে সাহসের ও সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইংরেজের শাসনাধীনে থাকিয়া ইংরেজের তীব্র সমালোচনা করা খুবই দুঃসাহসের কাজ। অনেক কথা কাটছাট দিয়াও যাহা আছে তাহাতে ইংরেজ-বিদ্বেষের ঝাঁঝ ও তীব্রতা কমে নাই—ইংরেজের পক্ষে যে খুবই অসহ—'proscribed' করিবার ইতিহাসেই তাহার প্রমাণ।* কেহ হয়ত বলিতে পারেন—যেহেতু জহরা ক্লাইবের নিকট যে উক্তি করিয়াছে ("ভারতবর্ষে দীন প্রজা দিবারাত্র হাহাকার করছে, ভারতবর্ষ শক্তিহীন······ সেই শান্তি স্থাপনের ভার ঈশ্বর তোমাদের উপর প্রদান করেছেন) তাহাতে ইংরেজ তোষণের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে নাগরিকগণের উল্লাস-গীতিতে, ইংরেজ-মহিমাই ধ্বনিত হইয়াছে—"এরা রাজার রাজা পালনে প্রজা, ছোট বড় এক সমান"—ইংরেজ-প্রশস্তির পরাকাষ্ঠা। সেই হেতু গিরিশচন্দ্রকে প্রগতিপন্থী না বলিয়া প্রতিক্রিয়াশী বলাই উচিত কিন্তু তাহাকে মনে রাখিতে বলি—সমগ্র নাটকের যে সুর সুরের তুলনায় এই দুই একটা ধ্বনি অতিশয় নগণ্য। ইংরেজ আমলে ই রাজপুরুষদিগের চোখে ধুলা দেওয়ার যে প্রয়োজন আছে তাহা দেখে চলিবে না। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ইংরেজ-সমালোচনায় সে নির্ভীক সেখানেই আসল ও প্রগতিশীল গিরিশচন্দ্রকে পাওয়া যাইবে।

* বিষয়বস্তুর প্রতি নাট্যকারের এই মনোভঙ্গী,—বিষয়বস্তুর সহিত ও গভীর আবেগের সম্পর্ক; জাতির ঐকান্তিক আবেগের পরিতর্পণের দিকে রাখিয়া 'বস্তুর' উপস্থাপনা এবং সক্ষম উপস্থাপনা ভাবের ও রসের গাম্ভীর্য, মিলিয়া নাটকখানিকে এমন একটি অর্থ-গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে, যাহ নাটকীয়তার কলঙ্করেখাকে আপনার মধ্যে শোষণ করিয়া লইয়া ঐ ভাবদ্যুতিকেই বিভূষিত করিয়াছে।